শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আড়াল

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৬

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

পুষ্পলাবী

অচেনা

আড়াল

ওয়ালটেয়ার আপল্যাণ্ডের মামিডি-পল্লীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আশ্রয় নিয়েছি না বলে, বিশ্রাম করছিলাম বলাই বোধ হয় সংগত। ডাক্তারের নির্দেশ, বুকের অসুখ আর জ্বর কাশির ধাক্কা সামলাবার পর সতর্কতার সঙ্গে একটু ফাঁকা জায়গায় নিরিবিলি অবসর বিনোদনের দরকার। তাই বুড়ো বাপের রক্ত-জল-করা অর্জিত অর্থের ওপর নবাবি করতেই যেন চেঞ্জে এসেছি। নিম্নমধ্যবিত্ত চাকুরে বাবার আমি একমাত্র উপযুক্ত রুগ্ন ছেলে। ক্ষয়রোগ বাধিয়েছিলাম। যমে-মানুষের টাগ্-অব্-ওয়ারে তিনি জয়ী হয়ে আমাকে পুনর্বার লাভ করেছেন—এই সান্ত্বনা নিয়ে তিনিই চেষ্টাচরিত্র করে অন্ধ্রপ্রদেশের এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মাসকাবারী টাকা পাঠান, বোধ হয় ট্রাম-বাসের ভাড়া বাঁচিয়ে, বোধ হয় নিজেদের—মা আর বাবার—একবেলার খোরাক বাঁচিয়ে ছেলের স্বাস্থ্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করছেন। আমার জ্বরকাশির পেছনে যখন গ্যালপিং এই রোগটি ধরা পড়লো—তখন থেকেই বাবা চা খাওয়া ছেড়ে দিলেন পয়সা বাঁচাতে; নিজের চোখে তা দেখেছি। তিনি বললেন—এই বাজে জিনিসে অর্থব্যয় না করে, ওই ক'টা পয়সা বাঁচিয়ে খোকার একটা করে মুরগীর ডিম ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এহেন পিতার অর্থ ধ্বংস করার একটা গ্লানিময় যন্ত্রণাকর অনুভূতির মধ্যে দিন কাটছিল।

এখানকার দৃশ্যপট ভালো, সমুদ্রের তরংগভংগ, পাহাড়ে তটরেখা তমাল-তাল-বনরাজি-বেষ্টিত, উঁচুনীচু লাল জমি। দূরে কাছে ছোটবড়

পাহাড়। তার ওপর নির্জনতা। একদিকে প্রকৃতির উন্মুক্ত আশীর্বাদ, অন্যদিকে তেমনি নীরব নির্জনতা।

ধীরে ধীরে সেরে উঠছিলাম, কিন্তু বাবার কড়া শাসন—আমি যেন হুট্ করে না কলকাতায় যাই। মা আর বাবা এসে আমায় নিয়ে যাবেন, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পর।

যে কথা বলতে বসেছি—সেখানে আমার সম্পর্কে আমার ব্যাধি, পিতৃস্নেহ প্রভৃতি বিষয়ে এতটা বিস্তারিত না বললেও চলতো। আমার মূল আখ্যানভাগ যাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—সেখানে আমার কোনো স্থান নেই। ফিকে-রঙ পটভূমি হিসেবে একটা ধূসরাভ পর্দার মতোই আমাকে টাঙিয়ে রাখা চলে। তাই গোড়াতেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি, একটা বিচিত্র সাংঘাতিক গল্প বলতে গিয়ে নিজের কথাই ভূমিকায় বড় বেশী বলে ফেললাম। বোধ হয় জীবনের অক্ষম অসফল মানুষের এইটেই স্বভাবজাত ধর্ম।

বাবা একখানা করে বাংলা কাগজ পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন—সেটি বাসী হয়ে ওয়ালটেয়ারে আসতো। তাই প্রতিদিনকার টাটকা খবর পেলবার জন্যে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে যেতাম। তাছাড়া সারাটা দিন করিই বা কি!

লেখালিখি ত' প্রায় বন্ধ, আর বাবাও আমার এই লেখালেখি কাজের উপর খুব চটেছিলেন। তাঁর ধারণা—একটা লেখা নিয়ে একবার সম্পাদক বন্ধু, আর একবার প্রকাশক বন্ধু কিম্বা আর একবার তদ্বিরে বন্ধুর দরজায় দরজায় ঘুরে আর চা বিড়ি পান করেই নাকি আমার এই রোগ। তিনি তাই নিষেধ করে দিয়েছেন বিশেষ করে—কিছু দরকার নেই লেখক হবার। অবশ্য ঠিক এই কারণেই লেখা বন্ধ করেছি—তা নয়। একটানা কিছু চিন্তা করতে গেলে মাথাটা ঘুরে যায় এখনো। তাই শুধু হাল্‌কা রচনা পড়েই সাহিত্য-জীবনকে জিইয়ে রাখছিলাম।

ঠিক এইরকম সময়ে সংবাদপত্রে একটা বাসী খবর পড়ে আমার গা মাথা থরথর করে কেঁপে উঠলো। খবরটি ছোট্ট। মুকুন্দ খুন করেছে শিবেনকে। কিন্তু কেন—সে কথা নেই। প্রথমটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে খবরটি আবার পড়লাম। হ্যাঁ, আমারই তুই বন্ধুর খবর, এক বন্ধু অন্য আর এক বন্ধুর দ্বারা নিহত হয়েছে। সংবাদটি ছোট, কিন্তু এই ত' স্পষ্ট লেখা—টালীগঞ্জের দক্ষিণে রাউত-নগরের মুকুন্দ সোম ভবানীপুরের ল্যান্সডাউন রোডের শিবেন পুরকাইতকে খুন করেছে। মুকুন্দ সোমকে ধরা যায় নি। সেই থেকে সে পলাতক। কুঁজো বিকৃত পংগু চেহারার বেঁটে-খাটো মানুষ মুকুন্দ সোম। সেই যে শিবেনকে খুন করেছে—শিবেনের এক চাকর নাকি তা দেখেছে।

আজকাল কাগজে সংবাদের মধ্যে রস-সঞ্চারের জন্যে সংবাদকে ঘুরিয়ে পরিবেশন করতে হলেও, আসলে ঐ সংবাদের মর্মার্থ এইটুকুই। মুকুন্দের চেহারার বর্ণনা দেওয়া না থাকলেও রাউত-নগরের উল্লেখেই আমি মুকুন্দকে চিনতে পারতাম। ল্যান্সডাউন রোডের শিবেন পুরকাইতকেও।

আমার সঙ্গে মুকুন্দর বা শিবেনের যতটুকু হৃদ্যতা, তার চেয়ে ঢের বেশী বন্ধুত্ব ছিল ওদের তুজনের মধ্যে। শিবেন আর মুকুন্দ—আমি ত' ব্যাপারটা ভাবতেই পারছি না; অভিন্নহৃদয় তুজন বন্ধু ওরা। এমন একটা দিন, একটা মুহূর্ত দেখিনি—যার দ্বারা আমি কল্পনা করতে পারি যে ওদের পরস্পরের মধ্যে কখনো বিচ্ছেদের কোনো সম্ভাবনা আসতে পারে। এমন কি শিবেনের জীবনে যখন থেকে খেলা নামের একটি মেয়ে এসেছিল, তখনও শিবেন খেলার পাল্লায় পড়ে মুকুন্দকে ভুলতে পারেনি। বরং বেশী করেই সে আঁকড়ে ধরেছিল মুকুন্দকে।

খেলাকে আমিও চিনি। আমাদের কলেজে পড়তো, আমারই সহপাঠিনী। দেখতে শুনতে ভালো, চোখে মুখে স্নিগ্ধ শ্রী। কথাবার্তায় শোভন ও সংযত। চলনে বলনে নারীসুলভ একটা কমনীয়তা ছিল, বয়সের মেয়ে বলেই বোধ হয় লাবণ্যের একটা ঢল সমস্ত শরীরকে

উচ্ছল করে তুলেছিল। সব মিলিয়ে খেলাকে সকলেরই ভালো লাগতো,—বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এইরকম ললিত গতিভঙ্গীর চলনসই মেয়ে দেখতে পাওয়া দুর্লভ।

মুকুন্দ আর শিবেন আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো। মুকুন্দর চেয়ে কিনা জানি না, শিবেনের চেয়ে আমি বয়সে বড় ছিলাম। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্যে, ছেলেবয়সে একবার প্লুরিসিতে ভুগে দুটি বছর নষ্ট করি, তার ওপরে প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও একবার দাঁড়িয়ে যাই, এইভাবে মোট তিনটি বছর নষ্ট হওয়ায় কমবয়সী শিবেনের এক ক্লাস পেছনে পড়তে বাধ্য হয়েছি।

কলেজে ঢুকেই শিবেনের প্রতিপত্তি খুব হয়েছিল। শিবেন ওস্তাদ খেলোয়াড়, স্কুলে পড়ার সময়েই সে নাম করেছিল বেশ। ফুটবল-জগতে তার নাম শোনেনি—এমন ক্রীড়ারসিক ছিল না, তার ওপর কলেজ-টীমের সে ক্যাপ্টেন হয়ে এল। ফ্রী-তে পড়তো, সব সময় দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। অদ্ভুত স্বাস্থ্য ছিল। কখনো শিবেনের অসুখ করেছে বলে কেউ এপর্যন্ত শোনে নি। দেখতেও সে সুপুরুষ। উন্নতগ্রীব, সুঠাম দেহ, ফরসা গায়ের রঙ। এমন কি দেহে সামুদ্রিক অনেক সুলক্ষণও আছে। উজ্জ্বল প্রাণবান এক যুবক। 'মিস্টার বেঙ্গল' কি 'মিস্টার ইণ্ডিয়া' বলা চলে। সংস্কৃত সাহিত্যের শালপ্রাংশু, ব্যূঢ়স্কন্ধ ইত্যাদি বিশেষণের মূর্তিমান চেহারার মানুষ যেন।

মুকুন্দ ঠিক এর বিপরীত। তার চেহারা শিবেনের চেহারার ঠিক উল্টো। কুঁজো, বঙ্কিমগ্রীব, দুমড়ানো মেরুদণ্ড, কালো, কুৎসিত দর্শন। মুখের ওপর একটা ছোট্ট মার্বেলগুলির মতো অর্বুদ। বিশ্রী রকমের এই আবটা ছাড়াও তার ডান কাঁধটা বাঁ-কাঁধের চেয়ে উঁচু। হাঁটবার সময় মনে হতো বিরাট কোনো কচ্ছপ বুঝি থপ্ থপ্ করে চলেছে, একটা হাত কোমরে রেখে সে কোনোরকমে চলতে পারতো। মানুষের চেহারা যে কত বেঢপ আর বিশ্রী ধরণের হতে পারে—তার নিদর্শন হলো মুকুন্দ।

শিবেনের দিকে একদল ছেলেমেয়ের যেমন দৃষ্টি ছিল, মুকুন্দকেও তেমনি সকলে দেখতো। বিকৃত বা পংগু দেহ হলে হবে কি, মুকুন্দ আমাদের কলেজের গৌরবস্থল ছিল। সেকেণ্ডারি বোর্ডের স্কুল ছাড়ার শেষ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে সে রেকর্ড-মার্ক পেয়ে, কাগজে ছবি বেরিয়েছে—অবশ্য বাস্ট্-ফোটো। মুকুন্দ সরকারী বৃত্তি পায়। কলেজেও কোনো পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে কখনো সে দ্বিতীয় হয়নি। যে-কোনো কাজে দাও না কেন, যাতে বুদ্ধি-বিবেচনা বা চিন্তার পরিচয় আছে, মুকুন্দ সেকেণ্ড হবে না। কলেজের ম্যাগাজিনে সবচেয়ে সুন্দর প্রবন্ধ সে লেখে, বিতর্কের প্রতিযোগিতায় তার বলা আর চিন্তার গভীরতা দেখে সবাই অবাক হয়। কলেজের বাইরেও তার খ্যাতি আছে। শিবেন ফুটবল-ক্যাপ্টেন, লেখাপড়ায় তেমন নয়, অল্ বেঙ্গল ওয়েট লিফ্টিং-এ সেবার ফার্স্ট হয়েছিল, গোল্ড কাপ পুরস্কার জিতে এনেছে। ফুটবল খেলায় ওর জুড়ি নেই। কিন্তু লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা।

আমি যখন ফার্স্ট-ইয়ারে গিয়ে ভর্তি হলাম, শিবেন আর মুকুন্দ তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মুকুন্দর কথা আগেই শুনেছিলাম, যেবার আমি প্রবেশিকায় প্রথমে ফেল্ করি, সে-বছরই মুকুন্দ ফার্স্ট হয়। শিবেনের কথা প্রথম কলেজে ঢুকে শুনলাম।

ওরা দুজন দু'দিকের দিক্‌পাল। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াটা খুব আশ্চর্যের বটে। আমি ওদের দুজনের কোনো গুণের অধিকারী নই। আমি একদিকে যেমন স্বাস্থ্যহীন কুৎসিত দর্শন, অন্যদিকে তেমনি নির্বোধ বিবেচনাহীন। তবু এই দুজনের সংগেই কলেজ-জীবনে আমার আন্তরিক হৃদ্যতা হয়েছিল।

এবং সেটি সম্ভব হয়েছিল ঐ খেলা মেয়েটির জন্যেই। সে-অধ্যায়টির স্বল্প বর্ণনা দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না।

আমাদের কলেজে সহশিক্ষা ছিল। ছেলে-মেয়েরা একসংগে এক বেঞ্চে বসে পড়া-লেখা করতো। স্কুলে এ-জিনিস দেখিনি, ভাবিওনি। প্রথম প্রথম কেমন সংকোচ ঠেকতো, জড়তা লাগতো। পরে এসব কমে গিয়েছিল। এমনকি, মেয়েদের সংগে বসে ক্লাস-লেকচার শোনা এমনই

অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে কয়েকটি মেয়ে যদি ক্লাসে না আসতো—তবে সেই ক্লাস করতে ভালো লাগতো না। ভালো প্রফেসরের লেকচারও বিরক্তিকর মনে হতো। উঠতি যৌবনে মেয়েদের সেই সহজ সান্নিধ্য যে কি রকম নেশার মতো চেপে ধরেছিল—তা আজও মন থেকে ভুলতে পারিনি। হয়তো হাসি আসে সে কথা স্মরণ করে, কিন্তু তবু স্পষ্ট মনে আছে।

খেলা ছিল আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে সেরা মেয়ে। শুধু আমাদের ক্লাসের কেন, বোধ হয় আমাদের কলেজের মধ্যে ওরকম সুন্দর আয়তাক্ষী আর ছিল বলে ত' মনে পড়ে না। চেহারায় স্নিগ্ধ একটা লাবণ্যের স্পর্শ ছিল, দৈর্ঘ্য এবং অংগ-সংস্থাপনার অনুপাতও ছিল চমৎকার। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। যৌবনের দেবতা ওর দেহে তখন সবে উদ্দামতার পতাকা উড়িয়েছেন—খেলা মেয়েটির চেহারা সব মিলিয়ে যাকে বলে য়্যাপিলিঙ্।

খেলার সংগে আলাপ করবার জন্যে সকলে ছুঁক-ছুঁক করে বেড়াতো। যে-কোনো ছুতোয় যদি একটা কথা বলা যায়, খেলা যদি একটু প্রসন্ন দৃষ্টি হানে,—এমন কাঙালপনা প্রায় সব ছাত্রেরই মধ্যে ছিল। বলা বাহুল্য, আমিও অক্ষম পংগু প্রতিযোগীর মতো লোলুপদৃষ্টি মেলে কখনো কখনো খেলার দিকে হাঁ করে যে চেয়ে না থাকতুম—এমন নয়। কি জানি, যদি কখনো খেলা একবার তাকায়—বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ত' কখনো কখনো ছেঁড়ে!

ভালো ছেলে নই, থার্ড ডিভিসনে প্রায় আটকে পড়তে-পড়তে কোনোরকমে কলেজের মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ারের গোড়ার দিকে কোন্ এক উৎসাহী অধ্যাপকের প্রশ্নে সে তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। তার ওপর আমার রূপের বাহাদুর নেই। চেহারাটা নিজের হলে হবে কি, রঙে আর গঠন-সৌকর্যে সেটি এমন এক বস্তুতে পরিণত হয়েছে যে, বলতে দ্বিধা নেই—অন্ধকারে দেখলে ছোট ছেলেপিলে পর্যন্ত ককিয়ে কেঁদে উঠতে পারে ভয়ে। তার ওপর খুচরো অসুখ ত' লেগেই ছিল—সর্দি, কাশি, গা-হাত-ব্যথা, মাথাধরা, শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করা।

তবু এরই মাঝে মাঝে বসন্তকালের শুকনো রসিকতায় চমকে উঠেছি, মদনও মাঝে-মধ্যে ঠাট্টা করেছে কখনো-সখনো।

এদিকে খেলার পেছনে যারাই ঘোরাঘুরি করে—তাদের সকলের মুখে একটা সত্য প্রকট হয়ে উঠলো। 'খেলা শুধু নামেই খেলা নয়, কাজেও খুব খেলোয়াড় মেয়ে, নিজে না খেলুক—ও মেয়ে খেলাতে জানে।' তখন থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারের দাদাদের কাছ থেকে এ সব ব্যাজস্তুতি কি বক্রোক্তির সম্যক্ অর্থগ্রহণ করতে পারতাম না। তবু খেলার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে, বরং ভাব করার জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় (স্কুল ফাইনাল) বাবার ইচ্ছা এবং আশানুরূপ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে না পারায় তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন এবং আই. এ. পরীক্ষায় যাতে ভালো করতে পারি—সেজন্যে তিনি আমাকে প্রতিদিন কলেজে ক্লাস করতে পাঠাতেন। তাঁর আদেশ ছিল যেন আমি প্রতিটি ক্লাসে হাজির হই, নোট নিই ; আর আমি নিয়মিত ক্লাস করছি কিনা তিনি নজর রাখতেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে ক্লাসে আমি প্রত্যেক পিরিয়ডেই থাকতাম। ছেলেমেয়েদের কমন-রুম আলাদা,—সেখানে সময় কাটানো এমন কিছু নয়! বরং ক্লাস-ঘরটাই সব সময় কেমন যেন আনন্দময় ও কলরবমুখর 'ক্লাব-ঘর' 'ক্লাব-ঘর' মনে হতো—অবশ্য প্রত্যেক পিরিয়ডেই আধঘণ্টা পঁচিশমিনিট ছাড়া। তাই ক্লাসেই থাকতাম—কোথায় আর যাবো। ধূমপানের প্রয়োজন আমার প্রকট ছিল না—তাই প্রতি পিরিয়ডের শেষে বের হওয়ার তাগিদ থাকতো না।

ক্লাস-নোট টুকতে আমার মতো ওস্তাদ আর কেউ ছিল না। খুব দ্রুত লিখতে পারতাম। সেজন্যে প্রায় সব জরুরী নোট টুকে রেখেছিলাম। একদিন আচম্বিতে ঐ ক্লাস-নোট নেবার জন্যেই খেলা এসে আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করলে। সে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার—অন্ততঃ আর-সব ছেলে-ছোকরাদের কাছে—রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার।

ঘটনাটি সামান্য। সেদিন কি জন্যে যেন এক পিরিয়ড আগে ছুটি হয়ে গেল। লজিকের অধ্যাপক আসেন নি—তাই ক্লাস হলো না। টার্মিন্যাল পরীক্ষা এসে পড়েছে। আমাদের অধ্যক্ষমশাই শক্ত মানুষ,

পরীক্ষায় পাস না করলে কোনো কথা বা আবদার শুনতেন না। আর আমরাও বর্তমান যুগের ছাত্রদের মতো প্রমোশন আদায়ের হুজ্জুতি এবং কৌশলও জানতাম না, সুতরাং প্রতি পরীক্ষাতেই ভয়ের সঞ্চার হতো। কলেজে ক্লাস না হলেই এখন যে যার বাড়ি যায় দুর্ভাবনা নিয়ে। আজো প্রায় সকলে চলে গেছে, আমিও তাড়াতাড়ি নামছি বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে—যদি একটু বই-খাতা খোলা যায়—এই আশায়। সিঁড়ি দিয়ে যখন নীচে নামছি—তখন পেছন থেকে হঠাৎ মিহি সুরে কে যেন ডাকলে —শুনছেন!

কাকে-না-কাকে ডাকছে ভেবে আমি দাঁড়ালাম না।

আবার কানে ডাক এল, খেলার গলা, বেশ মিষ্টি আর মোলায়েম সুর এবং আমাকে লক্ষ্য করেই আবার শোনার অনুরোধ জানালে।

আমাকে ডাকছে খেলা! কী বিচিত্র, কী অচিন্তনীয় ব্যাপার!

বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করতে লাগলো। আমাকে ডাকছে খেলা —এ যে বিশ্বাস হচ্ছে না! আমাকেই ডাকছে ত'

খেলা ত্বরিত পায়ে গোটা তিনেক সিঁড়ি নেমে এসে আমাকে বললে —অত্যন্ত সহজ আত্মীয়তার সুরেই বললে—আপনার সংগে আমার একটু দরকার আছে। বিশেষ জরুরী, আর দেখুন—ঐ দরকারটা একটু গোপনীয়ও বটে!

ঘাবড়ে গিয়ে ক্যাবলার মতো আমতা আমতা করে বললাম—মানে আমার সংগে?

হ্যাঁ। কেন আপনার সংগে বুঝি আমার কোনো গোপন কথা থাকতে পারে না? খেলা এমনভাবে তাকিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে যে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। প্রশ্ন করার মধ্যে এরকম কায়দা-দুরস্ত বাহাদুরি আমি আর কখনো দেখি নি। চোখের চাহনিতে এমন করে একটা গোটা প্রশ্নকে কোনো মেয়ে মূর্ত করতে পারে—তা আমার জানা ছিল না। সিনেমা-থিয়েটারে এরকমভাবে নায়িকারা চায়-টায়, কিন্তু বাস্তব জীবনেও যে তা সম্ভব—কি করে জানবো। আমি আর কি বলবো এর পর? শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

ক্লাসে সমবেতভাবে মেয়েদের দিকে তাকাই, হাসি-মস্করা করি না যে —তা নয়। কিন্তু একা, এত কাছে, বিশেষ করে খেলার মতো মেয়ের সংগে গোপন জরুরী কথা কইবার সাহস হলো না। মেয়েদের নিয়ে মনে মনে কাব্য করলে কি হবে—বাস্তব ক্ষেত্রে আমি বেশ লাজুক। খেলাই বললে—কাল ক'টায় ছুটি আপনার ?

মরি-বাঁচি করে আমিও পাল্টা প্রশ্ন করলাম—কেন বলো ত' ?

খেলা একটুখানি চমকে উঠলো, আমিও কেমন সংকুচিত, সপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। খেলাকে 'তুমি' সম্বোধন করাটা বোধহয় ভালো হলো না। কিন্তু আমার চেয়ে ও বয়সে ছোট, ঠিক সেজন্যে বোধ হয় নয়, কতকটা ঘাবড়ে গিয়েই আমার মুখ থেকে 'তুমি' বেরিয়ে পড়লো। কিম্বা এমনিই বলে ফেললাম—কারণ প্রকাশ্যে খেলার সঙ্গে এর আগে কোনো কথা না বললেও, মনে মনে দু-একবার যে কাল্পনিক কথাবার্তা চালিয়েছি, তাতে খেলা 'তুমি' সম্বোধনেরই পাত্রী ছিল।

এই 'তুমি' সম্বোধনের জন্যে খেলাও তৈরি ছিল না। সে সামলে নিয়ে বললে—কাল আপনি কখন ফ্রী হবেন? একটু দরকার আছে।

তুমি হুকুম করলে আমার আবার কী কাজ ? **I am always at your service, madam** !—জিভের আড় ঘুচিয়ে ফেললাম। ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে আমি মন্দ ম্যানেজ করলাম না। তবে ভাষাটা কিছু কাব্যিক করতে পারলে ভালো হতো, খেলার সংগে কথা বলতে গিয়ে চিন্তার যেন সময়ই পাওয়া যায় না। কায়দা না জানলে তরংগক্ষুব্ধ সাগরে যেমন স্নান করা যায় না আরামে, কতকটা যেন সেই রকম। খেলাকে তাই সমুদ্রের সংগে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।

খেলা একটু হাসলে ; বললে—কাল তিনটের সময় লজিকের ঘণ্টার পর একবার আমার সংগে দেখা করবেন। বিশেষ অনুরোধ রইলো।— বলে খেলা চলে গেল। এলো করা রয়েছে খেলার চুল, চুলের গোড়ায় টকটকে লাল একটা ফিতে বাঁধা। ইংরাজীতে এ জাতীয় কেশ-বিন্যাসের যে নামই দেওয়া হোক না—আমার মনে হল এ যেন জলন্ত আগুনের

শিখা। মন প্রাণ সব ঝলসে যায়। খেলার হেঁটে যাওয়ার মধ্যে কেমন যেন মনমাতানো একটা ছন্দ থাকে! সংস্কৃত সাহিত্যে নায়িকার এইরকম অভিগমনের কত সুন্দর বর্ণনা আছে।

আমার কাছে খেলার কী অনুরোধ থাকতে পারে? খেলার জন্যে হাঁ করে কলেজের শতকরা পঞ্চাশ-ষাট ভাগ ছেলে প্রত্যাশাকাতর দৃষ্টি মেলে রয়েছে, আমি সকলের পেছনে অপেক্ষমাণ দীনতম প্রার্থী। আমার অলক্ষিত আর্জিই শেষে মঞ্জুর হলো? খেলা নিজে উপযাচিকা হয়ে কোনো গোপনীয় বিষয়ে আমার সংগে কথা বলতে চায়—সেই অনুরোধ জানিয়ে গেল।

এর পর থেকে সেদিনটা এবং পরদিন বেলা তিনটে পর্যন্ত খুব কষ্টে—কষ্টে কেন, বলা যেতে পারে একরকমের উত্তেজনাময় নেশায় কাটালাম। ঘড়ির কাঁটাও কখনো কখনো ধীর গতিতে চলে—তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল। কলেজে এসে খেলাকে দেখে একটু মন জুড়োলো। খেলা সকলের সামনেই বললে—মনে আছে ত'—আজকের য়্যাপয়েন্ট্মেন্ট? আপনি আবার যা বিস্মৃতিপ্রবণ—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। তিনটেয় 'ত'? তুমি আমাকে ডেকে নিয়ো!—আমি বেশ জোরে ক্লাস-ঘরের মধ্যেই খেলার কথার জবাব দিলাম। তখনো প্রফেসর আসেন নি। ইচ্ছে করেই একটু জোরে কথা ক'টি বললাম। আমি যে খেলাকে 'তুমি' বলে ডাকি—এ খবরটা জানুক সকলে। আমাদের ক্লাসের ছেলেদের হিংসা না-হয় একটু কুড়োবো। খেলা আমাকে বিস্মৃতিপ্রবণ বলেছে—খেলার মনগড়া এই বিশেষণটা শুনতে মন্দ লাগলো না!

খেলাকে যারা খেলোয়াড় মেয়ে বলেছিল—সেইসব দাদাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য না দিয়ে পারলাম না। আমি খেলা সম্পর্কে যখন বসন্তকাল, মদনদেব ইত্যাদির কথা আলম্বন ভাবছিলাম,—খেলা কিন্তু আমাকে নিভৃতে ডেকে আমার কাছে আমার ক্লাস-নোটগুলির জন্যে হাত পাতলে। সেই নীল চোখ, মদির ভাব, মিষ্টি হাসি তার সংগে জুড়েছে কাতর অনুনয়। চমৎকার কম্বিনেশন, মিহি ও মাজা গলায় খেলা বললে—পরীক্ষা-গংগা

পেরোবার জন্যে শুনেছি আপনি ক্লাস-নোটের সাঁকো তৈরী করেছেন। আপনি মহৎ জন, এই পরোপকারটুকু—

বাধা দিয়ে আশাহত করুণ ব্যক্তির মতো বললাম—ও, এইজন্যে এত অনুনয় বিনয়। তা গোপনে জরুরী ব্যাপার বলে টেনে আনার কোনো দরকার ছিল না। আমার খাতাগুলি এক এক করে নিয়ো, টুকে ফেরত দিয়ো। কেমন?

খেলার কাছ থেকে এমনতর ধাক্কা খাবো ভাবিনি। এই আমার প্রথম আঘাত-পাওয়া। মোহ-মদির অভীপ্সার তরী নৈরাশ্যের পাথরে ধাক্কা খেল!

আমার সংগে খেলার কোনরকম মন-দেওয়া-নেওয়া হয়েছে—এই রকম একটা চাপা জনশ্রুতি কলেজময় রটনা হয়ে গেল। থার্ড ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাস করা এক অখ্যাত কুরূপ ছেলের খ্যাতি যেন একমুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো। খেলার বন্ধু আমি, খেলার অনুগ্রহপুষ্ট আমি—কলেজের ছোটবড় সবাই আড়চোখে আমাকে দেখতে লাগলো। পথে বা কমন-রুমে, সিগারেটের দোকানের সামনে, কলেজ রেস্টুরেণ্টে যখন যেখানে আমি থাকতাম তখন সেখানে আঙুল দিয়ে প্রকাশ্যে আমাকে নির্দিষ্ট করতে লাগলো সকলে। খেলা আমাকে খেলাচ্ছে! অসহায় করুণ বোধ করলেও আমি যেন কলেজের তাৎকালিক এক হিরো হয়ে উঠলাম। খেলা খেলাচ্ছে, আমি খেলছি—না; আমি খেলোয়াড়, খেলাকে গেঁথেছি বঁড়শিতে। একটু একটু সূতো গুটোচ্ছি—আর খেলা খেলছে? সকলের গবেষণা এই নিয়ে।

একদিন বিকেলের দিকে কলেজ থেকে বের হচ্ছি। হাতে বই-খাতা রয়েছে। কলেজ-গেটে শিবেন তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ শিবেন আমাকে ডেকে বললে—কি খবর? ভালো আছো? কেমন হচ্ছে পড়াশুনো? কলেজ-লাইফ বেশ লাগছে, না?

এক নিঃশ্বাসে শিবেনের কথা-বলা অভ্যাস আছে। আর একসংগে অনেক প্রশ্ন করাও ওর স্বভাব। কিন্তু আমার মতো সংকোচশীল ছেলের পক্ষে একসংগে অতগুলি জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

তা ছাড়া শিবেন পুরকাইত—কলেজের সেরা এথ্‌লেট, সে আমার সংগে কথা বলেছে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করেই ক্ষান্ত হলাম।

খেলা আমার সঙ্গে কথা বলেছে—এ যত বড় খবর তার চেয়ে কম বিস্ময়ের খবর নয় যে, শিবেনও যেচে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু শিবেনের দাক্ষিণ্য পাওয়া-না-পাওয়াটা অন্যের মাথা ঘামানোর বস্তু নয়—বলে তার-রটনাও অপেক্ষাকৃত কম।

সেই থেকে শিবেনের সংগে আমার আলাপ। দেখা হলেই শিবেন আমাকে ডাকে, কথা বলে, কখনো চা খাওয়ায়, কখনো তার ফুটবল গেম দেখাতে নিয়ে যায়। ইদানীং শিবেন যেন বেশী করে আমাকে কাছে টানতে লাগলো।

অবশ্য শিবেনের সংগে আমার কথাবার্তা হয় দেখে খেলাও যেন বাড়তি একটু খাতির করে আমাকে। এটা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। শিবেনের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে খেলারও আছে।—কী ভালো চেহারা শিবেনবাবুর—না?—ইদানীং কতবার খেলার মুখে আমি এই কথা শুনেছি। শুনে কখনো হেসেছি, কখনো ঈর্ষা করেছি। কল্পনার মুগ্ধ চোখ মেলে খেলা শুধু শিবেনকেই দেখেছে!

আজ যতদূর মনে পড়ছে—আমার মাধ্যমেই খেলার সংগে শিবেনের প্রথম আলাপ।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কলেজ বসেনি ভালো করে, কোলকাতার প্রায় অর্ধেক-সংখ্যক রাস্তায় একহাঁটু জল; দু'-একটা সরকারী বাস জলযানের কায়দায় চলাফেরা করছিল। অধ্যাপকেরা কলেজে আসেন নি। কলেজেও ছেলেমেয়ে উপস্থিত হয়েছিল সর্বসাকুল্যে তেরো-চোদ্দটি। এই তেরো-চোদ্দজনের মধ্যে আমি ঠিক আছি। বাবার সতর্ক প্রহরা —কলেজের ক্লাস যেন কামাই না যায়। কিছুটা ভয়ে আর কিছুটা জলে ভিজতে আমার বেশ লাগে বলে ওয়াটার-প্রুফ জুতো পায়ে জল ডিঙিয়ে কলেজে এসেছিলাম। এসে দেখি খেলা রয়েছে আমাদের সেক্‌শনের। বৃষ্টির পরিবেশে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে—কেন, কিসের জন্যে, আর কী ধরনের সেই ব্যাকুলতা—তার বিশ্লেষণ না করেই

মনটা কেমন কেমন করে! শ্রাবণ-মন-ভাবন-কী বলে মন যেন গান গেয়ে ওঠে। আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের সংগে মানব-মনের মিলন-বিরহের একটা বড় যোগ আছে—আজ তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বর্ষায় বড্ড মন কেমন করে—কবিরা তাই প্রেমের ব্যাপারে বর্ষাকে পটভূমিতে সাজিয়েছেন। আমার মনেও কেমন যেন বর্ষা-ব্যাকুল এক প্রেমিক জেগে উঠলো। এর ওপর রয়েছে খেলা।

খেলা বললে—কমন-রুমে আপনার বন্ধু শিবেনবাবু আছেন, আরো দুজন ফুটবল-খেলোয়াড়ের সংগে আড্ডা দিচ্ছেন, একবার ওঁকে ডাকুন না—আমার সংগে আলাপ করিয়ে দিন না।

কমন-রুমে গিয়ে দেখি শিবেনও আলোচনা করছে—খেলা এসেছে, এই বৃষ্টিতে মানুষ কাজে বের হতে পারছে না—আর উনি এসেছেন কলেজ করতে! She is surely a man-trap,

আমি বললুম—শিবেন-দা, খেলার সংগে আলাপ করিয়ে দিই, চলুন! শিবেন লাফিয়ে উঠলো! নির্বোধের মতো আমি অর্থহীন যোজকের ভূমিকা অভিনয় করে বর্ষাকে অভিবাদন জানালাম! বুঝলাম সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।

আমার মাধ্যমেই সেদিন উভয়ের আলাপের সূত্রপাত। আর সেই আলাপ আমাকে মধ্যে রেখেই বেড়ে উঠলো। পরে যেমন হয়—আমাকে ছাড়াই সেই আলাপ জমে উঠলো প্রচণ্ডভাবে। চারাগাছ বাড়বার জন্যে প্রথমে ঘেরাটোপ দরকার হয়, পরে সেই ঘেরাটোপকে সরিয়ে ফেলতে হয়, নইলে মহীরুহের অসুবিধে ঘটে। শিবেন খেলাকে সিনেমায় নিয়ে যেত, ফুটবল-মাঠে ট্যাক্সি চেপে যেত খেলাকে নিয়ে—কখনো বা আমাকেও সঙ্গে নিত। কখনো আবার আমাকে অবাঞ্ছনীয় মনে হতো। বলেছি কিনা জানি না—শিবেন কোলকাতার বিখ্যাত দলে ফুটবল খেলে বেশ কিছু টাকা উপায় করতো। খেলার সংগে শিবেনের মেলামেশা শুধু একই কলেজের ছাত্রছাত্রীর আলাপের মতো জিনিস নয়, ওদের মেলামেশার ব্যাপারটা তার চেয়েও যেন গভীরে শিকড় বিছিয়েছিল। শিবেন

আমাকে যে সব কথা ইদানীং বলতো—তাতে শিবেনের প্রতি আমার যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল খেলোয়াড় হিসেবে, আস্তে আস্তে সেটুকুও কমে যেতে লাগলো। কলেজে-পড়া ছেলে প্রেম সম্পর্কে অমন চোখা-চোখা কথা কোথা থেকে শিখলো? খেলাকে সে প্রায়ই ছোট-বড়-মাঝারি প্রেমপত্র লিখতো। একবার শিবেনের একটি চিঠি দেখার বরাত আমার হয়েছিল। শিবেন খেলাকে সম্বোধনের পাঠ লিখেছে—'হৃৎপিণ্ডেশ্বরী' বলে। শুধু এই রসিকতাই নয়, পত্রখানার প্রথম দু-চার লাইন দেখে, ঘেন্নায় আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগলো। কোনো রুচিমান ছেলে এতদূর নামতে পারে—অন্তত লিখিতভাবে?

শিবেনের ফুটবল খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি অনেকবার, ভারতবর্ষের হয়ে খেলেছে বিদেশীর বিরুদ্ধে, জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলেছে, বিদেশে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ক্রিকেট খেলাও দেখেছি কয়েকবার—বেঙ্গলের হয়ে খেলেছে রণজি ট্রফিতে, চমৎকার ব্যাটিং করেছে, কী অদ্ভুত স্ট্রোক! অথচ পাশব একটা দুর্বুদ্ধি এই শিবেনের ঘাড়ে ভূতের মতো কেন যে চেপে বসেছে—তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি নি! খেলাকে পেয়েই যেন সে নিজেকে চূর্ণ করে ফেলতে চায়। অথচ শিবেনকে প্রয়োজন ভারতবর্ষের ক্রীড়া-জগতে।

শিবেনকে আকারে ইংগিতে বলাও হলো—সতর্ক হও। তুমি ভারতবর্ষের নামকরা খেলোয়াড়, নিজেকে এভাবে নষ্ট করার অধিকার তোমার নেই! No, you can't ruin yourself thus! এভাবে তোমাকে নষ্ট হতে দেওয়া হবে না।

শিবেনও হাসতে শিখেছে, এর মধ্যে, খেলার পাল্লায় পড়ে। অল্প একটু হেসে সে বললে—খেলাই আমার প্রাণ! I'm a sportsman!

খেলাধূলো আর খেলা-মেয়ে ত' এক নয়, শিবেন।

খেলা is খেলা। আমি তোমাদের উপদেশ মানি না—মানতে চাই না। শিবেন যে একরোখা—তা সবাই জানতো।

সত্যিকথা বলতে কি, খেলা সম্পর্কে আমারও একটা প্রচ্ছন্ন হা-হুতাশ

ছিল। সেটার জন্যে অবশ্য এখন আর কোনো বেদনা নেই। খেলাকে খেলোয়াড় মেয়ে বলে জানতে ত' আমার আর বাকী নেই।

একদিন ছোট্ট বাঁকা এক হাতের ইশারায় মুকুন্দ আমাকে তার কাছে ডাকলে। আমি কলেজ রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। মুকুন্দ কলেজ কাফেতে ঢোকে না। সে বলে—ওটুকু বাজে সময় খরচ করার মতো বাড়তি সময় তার হাতে নেই।

মুকুন্দ কলেজের মধ্যে সেরা ছেলে, হীরের টুকরো বললেও কম বলা হয়। ওর মুখে এইরকম কথাই সাজে। নানা রকমের গুণে বিভূষিত বলে, বিকৃত চেহারার এই অসহায় ছেলেটিকে নিয়ে কেউ কখনো ব্যংগ করে নি। বরং তার পংগুত্বের জন্যে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করার মন নিয়ে সকলেই এগিয়ে এসেছে।- লেখাপড়ায় ভালো হলে মানুষের কাছে কি গভীর শ্রদ্ধাই না পাওয়া যায়। মুকুন্দকে দেখে সে-কথা মর্মে মর্মে বুঝেছি। সত্যি, বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।

মুকুন্দ আমাকে কাছে ডেকে বললে—তোমার সংগে আমার একটা জরুরী কথা আছে, ফল্টু।

প্রথম প্রথম মুকুন্দকে 'আপনি' বলে শ্রদ্ধাবাচক উক্তি করতাম, কিন্তু সে নিজে ধমকে আমাকে তুমিত্বের গণ্ডীতে বেঁধেছে। 'আপনি'টা বড্ড উঁচু বা দূরের জিনিস, এক কলেজের ছাত্র আমরা, তার ওপর বন্ধুও বটে, 'তুমি'ই ডাকাডাকির পক্ষে ভালো। কি বলো?

যথা আজ্ঞা!

মুকুন্দের দুটি চোখে যে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখেছি, সেরকম ঔজ্জ্বল্য আমি আর অন্য কোনো মানুষের চোখে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যারা বড় হয়, মেধাবী হয়, প্রতিভাবান্ হয়—বোধ হয় তাদের চোখে এইরকম জ্যোতি থাকে। তার ওপর সরলতার ব্যবহার, অমায়িক তার কথাবার্তা। সকলকে সে মুগ্ধ করে রেখেছে। সে যেন সত্যিই একটা পণ্ডিত ছেলে, তার বিনয় দেখলেই তা বোঝা যায়। তবু মাঝে মাঝে আমার কাছে দুঃখ করতো—আচ্ছা ফল্টু, আমি বিকৃতদেহ

বলে তোমাদের বুঝি খুব করুণা হয় আমার ওপর? তাই যখন যাকে যে-কাজের জন্যে ডাকি সে ত' সেটুকু করেই, উপরন্তু আরো কিছু বেশীটা করে দেয়। সেদিন কলেজের বার্ষিক ডিবেটিং সভা ছিল, তুমি ত' আসো না ওসব ব্যাপারে, কাজেই তুমি জানো না যে সেদিন আমি কি রকম কষ্ট পেয়েছি—আমার কলেজ ফ্রেণ্ডদের ব্যবহারে।

কি রকম বেদনা সে পেয়েছে—তা শোনার ইচ্ছে আমার হলো। আমি বিতর্ক-সভায় যাই নি বটে, তবে শুনেছি বরাবরের মতো এবারও মুকুন্দ বিতর্কে প্রথম হয়েছে। কিন্তু কলেজের বন্ধুরা তাকে ব্যথিত করেছে—এ খবর ত' শুনিনি। এ সংবাদে আমিও দুঃখ পেলাম। খবরটা জানার কৌতূহল হলো।

সে বললে—বিতর্ক-সভার সভাপতি মশায় আমার চেহারা দেখেই বোধ হয় করুণা করে আমাকে সকলের চেয়ে পাঁচমিনিট বেশী সময় দিলেন এবং আমার বলা শেষ হতে-না-হতেই আমার ক্লাসের বন্ধুরা আমাকে জল এনে দিলে এক গ্লাস; আমার হাতেই দিতে পারতো, কিন্তু একেবারে মুখের কাছে গ্লাস তুলে ধরলো, যাতে শুধু চুমুক দেওয়ার কাজটুকু করলেই জলপানের তৃপ্তি ঘটে। আমি বললাম খাদ্যবস্তু অন্য লোক চিবিয়ে দিলে দাঁতের ব্যায়াম করতে হয় না বটে, কিন্তু খাওয়ার আনন্দও অনেকটা কমে যায়। ডান হাতটা আমার পংগু নয়, জলের গ্লাসটা ধরার মতো ক্ষমতা আমার আছে।

ব্যাপারটা বুঝলাম। মুকুন্দর দেহবিকৃতির জন্যে তার সচেতনতা ছিল পুরোমাত্রায়।

মুকুন্দ তার বিকৃত দেহের জন্যে যে কখনো ব্যথা পেতে পারে—এ আমার জানা ছিল না, তবে তাকে অযথা সাহায্য করতে এলে সে রুষ্ট হতো—তা আমি জানতাম। সে যে পংগু এটা তাই আমার আচার-ব্যবহারে আমি কখনো প্রকাশ করিনি। সেজন্যেই বোধ হয় অমন বুদ্ধিধর মানুষের সংগে আমার এই ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হয়েছিল।

মুকুন্দ বললে—শিবেনের সংগে খেলার এত মেলামেশা কি খুব ভালো হচ্ছে ফন্টু? তুই কি বলিস্?

মুকুন্দ আমাকে খুব ভালবাসে বলেই 'তুমি' থেকে 'তুই' পর্যায়ে নেমেছে।

আমি এ ব্যাপারে কি বলবো বলো ? খেলা মেয়েটা যে সুবিধের নয়, সে-কথা কলেজ-সুদ্ধ সকলেই জানে। আমি আর বললাম না যে আমিও মেয়েটার জন্যে ভেতরে ভেতরে ধিকিধিকি পুড়ছি।

তুই তার মাধুকরীর খবর কিছু রাখিস ?

মাধুকরী শব্দটির অর্থ জানতাম না বলে চুপ করে গেলাম। মুকুন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, খেলা আর শিবেনের সম্পর্ক নিয়ে সে যেন খুব চিন্তা করছে—এটা বেশ বোঝা গেল। সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে; তাই সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে লাগলো—জানিস খেলার ইতিবৃত্ত ? ওর পেছনে শিবেন ঘুরছে—পুড়ে মরবে যে ছেলেটা ! আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, শিবেনকে গ্রাস করে ফেলবে মেয়েটা, পুড়িয়ে মারবে। শিবেনকে বাঁচাতেই হবে ওই আগুন থেকে। শিবেন আমাদের দেশের একটা আশা-ভরসা—বিশেষ করে খেলার জগতে। এতবড় ভবিষ্যৎওলা ছেলে একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে খেলার মতো এই সামান্য একটা মেয়ের পাল্লায় ?

আমার মতো অক্ষম অসফল জীবন মুকুন্দের নয়, অন্ততঃ পাণ্ডিত্যে, তর্কের পদ্ধতিতে, অধীতী হিসেবে সে বিখ্যাত ছিল। সেই খ্যাতির জৌলুস নিয়ে আর মনের গুপ্তজ্ঞানের মাধ্যমে খেলার মনোভূমি বা মননলীলায় একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে বসেছে নাকি মুকুন্দ ? বিচিত্র কিছুই নয়, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। শিবেনের প্রতি তার ঈর্ষা কি এইজন্যে ?

মুকুন্দ বললে—শিবেন ধীরে ধীরে নিজের সাধনার বস্তুগুলির প্রতি অমনোযোগ দেখাচ্ছে, খেলাকে সে বেশী কাছে টানছে, খেলা মানে স্পোর্টস্ নয়, আমাদের ওই মেয়েটা। শিবেন একটা ব্রিলিয়াণ্ট্ ছেলে, হীরের টুকরো হয়ে জ্বলে ওঠবার সম্ভাবনা ওর মধ্যে আছে। কিন্তু ও নিজেকে জানলো না !

মুকুন্দের প্রতিটি কথায় আক্ষেপ আর বেদনা ঝরে পড়তে লাগলো।

একটু থেমে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা ফল্টু, তুই-ও না খেলার পাল্লায় পড়েছিলি কিছুদিন? তোকেও ত' খেলিয়েছে বেশ কিছুদিন? —না?

হ্যাংলার মতো আমি যে খেলার পেছন পেছন ঘুরতাম—এ আর কারুর অবিদিত নেই। তাই অস্বীকার করতে পারলাম না।

আমি বললাম—তুমি দাদা-লোক, তোমার কাছে কিছু লুকোবো না। খেলার সংগে মেলামেশার একটু সুযোগ যে আমি পাই নি, তা নয়। তবে দেখলাম—ও বড় তুখোড় মেয়ে। শুধু ছুয়ে নেবার তাল। সুষ্ঠু চেহারার লাবণ্যই ওর ক্যাপিটাল—দাদা!

অর্থাৎ?—বলে মুকুন্দ এমন তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে যাতে আমার ভস্ম হয়ে যাবার কথা। বোধহয় শরীরটা কংক্রীটের, তাই সে-যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলাম। পুরুষের চোখেও যে এমন রুদ্ররূপী অগ্নিবাণ থাকে—জানতাম না।

আমি বললাম—আমার ক্লাস নোট বাগাবার জন্যে আমার হাতের মুঠোয় ধরা দিতে সে কিন্তু 'না' করে না, শিবেনের সংগে সিনেমায় যেতে তার দ্বিধা নেই। অথচ অকারণে একটা মুহূর্ত গল্প করতে সে নারাজ।

হুঁ—বলে মুকুন্দ গভীরভাবে কী ভাবতে আরম্ভ করলে।

আমার বাবা বদলি হয়ে গেলেন। মার্চেণ্ট অফিসের ছোট কেরানী তিনি। তাঁকে অফিসে বড় একটা কেউ মান্যগণ্য করে না। তিনি একে নিরীহ, তার ওপর বর্ষীয়ান, রিটায়ার করার বয়সও হয়ে গেছে। তাই তাঁর ওপর বদলির হুকুম সবচেয়ে বেশী নিরাপদ—এটা অফিসের কর্তারা ভালোই বুঝেছেন। দু এক বছর পরই তাঁকে স্থানান্তরে যেতে হয়, বড়সাহেবের বাড়ির বাজার করেন না বলেই বোধহয় এই ঝঞ্ঝাট!

আমাকে ওঁর সংগে, মানে বাড়ির সংগে যেতে হলে কলেজের পড়ায় ছেদ পড়ে। রোগে দু'বছর আর সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডের নৈষ্ঠুর্যে এক বছর জলাঞ্জলি দেওয়ায় আমার আয়ু ভাণ্ডার থেকে আর সময় ব্যয় করা যায় না ভেবে বাবা আমাকে মেসে রাখার ব্যবস্থা করলেন। মেসের খরচ যোগাতে তাঁর যত কষ্ট হোক, এ ছাড়া গত্যন্তর

ছিল না। মুকুন্দ এ কথা শুনে হাঁ হাঁ করে উঠলো। সে বললে—চল তো, জ্যাঠামশাই জ্যেঠিমার কাছে গিয়ে ঝগড়া করে আসি। রাউত নগর বানিয়েছি আমরা, আমাদের মস্ত বড় বাড়ী ফাঁকা পড়ে কাঁদছে সেখানে, আর তোর থাকার জায়গা হবে না? মেস ফেসের আইডিয়া মাথা থেকে ছুড়ে ফেলে দে ফল্টু। আমার পাশের ঘরেই তোর থাকার ব্যবস্থা হবে– বুঝলি?

সোজা কথা, না বোঝবার কিছু নেই। মুকুন্দ মানুষকে এমন করে কাছে টেনে নিতে জানে। তার কথার মধ্যে আবেগ বা আবেদনের সুর থাকে না, কিন্তু এমন আন্তরিকতাপূর্ণ—অস্বাকার করার জো নেই!

বাবা এ কথা শুনে সৃষ্টিকর্তার কাছে মুকুন্দের মংগল কামনা করলেন—মুকুন্দের সামনেই। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে মুকুন্দ আমাদের পরম উপকার করলে। সংকোচে, লজ্জায় মুকুন্দ কুঁচকে গেল যেন।

মুকুন্দ শিবেনের ঠিক বিপরীত দিক। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ত' বটেই, এমন কি চরিত্র-রচনার দিক থেকেও।

শিবেন মেয়েদের সংগে অবাধে মিশতে পারে। সে একবার কথা বলতে শুরু করে দিলে কেমন সুন্দর চোখ মুখের অভিব্যক্তি করে, মুকুন্দ তেমন পারে না। কোথায় যেন আড়ষ্টতার কাঁটা তাকে বিদ্ধ করে। শিবেন কাজের কথা কোনো মেয়েকে কখনো সংক্ষেপে বলে না; এমনকি তাকে সিনেমা কি খেলার মাঠে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও খুব বিস্তৃত করে ব্যক্ত করে। কথা বলায় তার জুড়ি মেলা ভার।

মুকুন্দ এর উল্টো দিক। বিস্তৃত কাজের কথাকে সে খুব সংক্ষেপে উত্থাপন করে, ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার আর্ট সে জানে না—তা নয়, কিন্তু কখনো কোনো মেয়ের সামনে সে সেই কৌশল হাজির করে না, সংক্ষেপে দরকারী কথা সেরে নেয়। সংকোচের একটা পর্দার আড়ালে থাকতে সে সব সময় ভালবাসে। শিবেনকে কখনো একা থাকতে

দেখা যায় না, কখনো চিন্তা করতে দেখা যায় না, কোনো একখানা বই নিয়ে গভীর মনোযোগের সংগে সে পড়ছে—এমন ঘটনা বড় একটা কারুর চোখে পড়েনি। অথচ মুকুন্দকে প্রায়ই সংগীহীন হয়ে থাকতে দেখতাম। বাড়ীতে ত' বটেই, কলেজেও তাকে অনেক সময় নির্জন হয়ে বসে কী যেন ভাবতে দেখা যেত। কোনো দরকারে মুকুন্দর কাছে কেউ গেলে, মুকুন্দ সংক্ষেপে তার সংগে আলাপ সেরে ফেলতো। কখনো দেখতাম মুকুন্দ বই পড়ছে ত' পড়ছেই। কী গভীর অভিনিবেশ। চিন্তার পর্দায় মনটাকে সে মুড়ে রাখে। শিবেন হট্টগোলে, মুকুন্দ আত্মমুখী। অথচ এই দুটি প্রাণীতে কী গভীর বন্ধুত্বই না রয়েছে! মুকুন্দ শিবেনের কল্যাণের কথা ভাবে, মুকুন্দ শিবেনের খোঁজ খবর নিতে ভোলে না। মুকুন্দ তাই শিবেনকে খেলার কবল থেকে বাঁচাতে চায়। ওই রকম একটা সুন্দর ছেলে—তীব্র আগুনের ঝাঁঝে ঝলসে যাবে—মুকুন্দ তা সহ্য করতে পারছে না। শিবেনকে সে গভীরভাবে ভালবাসে, মনের সমস্ত শেকড় দিয়ে শিবেনকে আঁকড়ে ধরেছে সে।

শিবেনও মুকুন্দকে প্রতিদানে কম ভালবাসে না। অনুগত স্নেহার্থীর মতো সর্বদাই সে মুকুন্দের প্রীতি ও সান্নিধ্যের মধ্যে এসে নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দেয়। বিপরীত এই দুটি চরিত্রের এমনভাবে মেলা-মেশার দৃশ্য কিন্তু সত্যিই দেখবার মতো বস্তু।

প্রতিদিন অন্তত কয়েকবার শিবেনের সংগে নিরিবিলি আড্ডা না দিলে মুকুন্দর চলে না। যদিও উভয়ের পরিচিত ব্যক্তি আমি, তবু কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছিলাম যে সহসা ওদের আড্ডায় যদি আমি হাজির হই তাহলে যেন ওদের কারুরই ভালো লাগে না। মুকুন্দ গম্ভীর হতো, শিবেনও উসখুস করতো। আমি সরে যেতে পথ পেতাম না। এক আধটি কথা কানে যা আসতো—মনে হতো খেলাকে নিয়েই বুঝি বা আলোচনা চলছে। খেলার সংগে আমারও আলাপ আছে—তাই বোধ হয় আমাকে এড়িয়ে চলতে চায় ওরা।

শিবেনের সংগে মুকুন্দ খেলা সম্পর্কে এত আলোচনা করছে কেন? নারীঘটিত ব্যাপার থেকে ত' সে সব সময় সাত হাত দূরে থাকতো।

আর এখন খেলাকে নিয়ে তার এমন কি আলোচনা থাকতে পারে শিবেনের সংগে যে, আমি পর্যন্ত সে আলোচনায় অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ি!

অবশেষে মুকুন্দও কি খেলা সম্পর্কে দুর্বল হয়ে পড়লো নাকি? আমি বিলক্ষণ জানি খেলাকে কেন্দ্র করে শিবেনের কোনো দুর্বলতা নেই।

শিবেন স্পোর্টসম্যান, স্পোর্টস হিসেবেই সে ওই মেয়েটাকে গ্রহণ করেছে। আমরা হয়তো খেলাকে পেলে হৃদয়ের মণিমহলে জায়গা করে দিতাম—শিবেনের সে জাতীয় কোনো বালাই ছিল না। মেয়েটা কাছে এসেছে, ধরা দিচ্ছে—আচ্ছা আসুক, আচ্ছা ধরা দিক—এই রকম ওর ভাব। খেলোয়াড়ের কাছে যেমন বল, শিবেনের কাছে খেলা তেমনি এক সামগ্রী।

শিবেন বলতো—মেয়েটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়লো, করুণভাবে এমন তাকালো—দু'বাহুর বলিষ্ঠ আশ্রয়ে তাকে স্থান দিলাম। বরং তোমরা আমাকে শিভ্যালরাস বলতে পারো। মেয়েদের ভালবাসা বা আশ্রয় দেওয়াই পুরুষদের কাজ; তাদের মাথায় নিয়ে ধেই ধেই করে নাচা নিশ্চয় নয়। আমি মেয়েদের ভালবাসি—ঠিকই, কিন্তু ভালবাসার যে প্যানপেনে জোলো দিক—সেটা মেয়েদের পক্ষেই শোভাকর। ও ব্যাপারে আমার কোনো উদ্যম নেই।

তা ঠিক। সূর্য দীপ্তি দিয়েই খালাস। প্রদীপের মতো সলতে বা তেলের আয়োজন করার কাজ তার নয়। নিজস্বতাতেই সে পূর্ণ।

শিবেন আরো অনেক কথা বলতো। আমার আজও এক আধটা কথা মনে আছে। সে বলতো—তোর ঐ খেলা কি একটা মেয়ে নাকি যে আমার সংগে শুধু ঘোরে? এই কলেজের মিলিতা, হেনা, বাসন্তী—ওরা লুকিয়ে যায় না আমার সংগে সিনেমায়? এই খবরটা সকলেরই জানা, কাজেই উৎসাহিত বোধ করতাম না। শুধু খেলা সম্পর্কে আমার উদ্যম ও কৌতূহল সীমিত থাকতো।

তাই খেলাকে নিয়ে শিবেনের সংগে মুকুন্দের এই গোপন কথাবার্তা শুনে এক এক সময় সন্দিহান হতাম,—মুকুন্দ কি শিবেনকে জপাচ্ছে

নাকি খেলার সংগে তার আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে? বঞ্চিত মুকুন্দের জীবনে খেলার সম্মোহ তাকে পেয়ে বসেছে বলেই কি সে শিবেনকে এমন করে ধরে বসেছে? তৃষিত মরুযাত্রীর মতো শুকনো মুখ মুকুন্দের, সেখানে কি খেলার মৌসুম প্রকাশের আয়োজনের ব্যগ্রতায় মুকুন্দের এই তৎপরতা?

খেলা সম্পর্কে আমার ভূত নেমে গেলেও, ও মেয়েটি সম্পর্কে এখনো কেমনধারা এক কৌতূহল রস আমাকে সিক্ত করে রেখেছে। মাঝে মাঝে মন কেমন যে না করে এমন নয়। তাই জানতে ইচ্ছা হতো মুকুন্দ আর শিবেন খেলার বিষয়ে কী কথা বলছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ওদের দুজনের কথাবার্তা থেকে কিছু বোঝা গেল না। বরং মুকুন্দর সংগে মাঝে মাঝে আমার যে কথাবার্তা হয়, তা থেকেই একটু স্পষ্ট হলো। যে শিবেনকে খেলার থাবা থেকে বাঁচাবার জন্যে মুকুন্দ খুব চেষ্টা করছে।

আমি বললাম—শুধু ত' খেলাকে নিয়েই শিবেন মত্ত নয়, ওর সংগে এ অঞ্চলের তামাম মেয়ের ফষ্টিনষ্টি চলে। শিবেনকে মেয়েদের হাত থেকে বাঁচানো মুশকিল।

মুকুন্দ গম্ভীরভাবে বললে—তা আমি জানি। তবে অন্য মেয়েদের সম্পর্কে ভয় নেই। ওরা মরসুমী ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। ঠোঁটে রঙ মাখছে, গান গাইছে। শিবেনকে ধরে বসন্ত উৎসব করছে। কিন্তু ওরা টিকবে না রে—বাতাস খরা হলেই ঝরে পড়বে। কিন্তু খেলা যে জাত ফুলের মতো জেঁকে বসেছে। ভয় তাই ওকে নিয়েই। আর শিবেন একটু একটু করে ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

খেলাকে নিয়ে কলেজেও ঢি ঢি পড়ে গেছে। খেলাকে জড়িয়ে আমার সম্পর্কে প্রাথমিক রটনা হলেও, আসলে শিবেনকে নিয়েই কলংকের কথা সবাই বলে বেড়াচ্ছে। আর এও বলছে যে ফল্টুটা খুব বেঁচে গেছে। কার পাল্লায় পড়েছিল—ও বোঝেনি। আরে বাবা, তুই গরীবের ছেলে, তোর ও সব ঘোড়া রোগ কেন?

আমি এ সবের ওপর কোনো গুরুত্ব দিই নি। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে খেলার প্রতি একটু মন কেমন করার ভাব এসেছিল মাত্র, খেলা

তার নিজের কাজ হাসিল করার জন্যে আমার কাছে এসেছে, হেসেছে, হাতছানির ছোট্ট ইশারায় আমাকে বেঁধেছে। আমি গরীবের ছেলে, নিজেকে পরে সামলাতে পারবো না ভেবে গোড়াতেই সতর্ক হয়েছি। তার ওপর মুকুন্দও বারণ করেছিল—ঘরে ধোঁয়া ঢুকলে দরজা জানলা খুলে ধোঁয়াকে সহজে বেরোবার পথ করে দিতে হয়, তার সংগে যুদ্ধ করতে নেই। তুই বোবার শত্রু নেই ভেবে চুপ করে থাক, ফল্টু—দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব আর কি—আমি নিজে খেলার প্রতিযোগী হিসেবে নাম প্রত্যাহার করেছি। সুতরাং আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই—বা আমার সংগে খেলার সম্পর্ক কোথাও বিশৃংখলার নয়,—সব ঠিক হয়ে যাবে কেন, ঠিক হয়ে গেছেই ধরা যেতে পারে। সামান্য একটু কষ্ট হয়েছে, বড় বেদনার খাদে পড়ে আহত হবার মূঢ়তা থেকে বেঁচে গেছি। খেলা সম্পর্কে আমার মোহ টুটে গেছে, কৌতূহলও কমে এসেছে, একটা দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা শেষে প্রসন্ন নিদ্রার আরাম অনুভব করতে পারছি।

রাউত নগরে এসে মুক্ত আলো-বাতাসের মুখ দেখতে পেলাম। সন্ধ্যার তারকাখচিত আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাসের প্রলেপ, মাটি গাছপালা—সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক অনাবিল সাহচর্য—তার ওপর মুকুন্দর এই বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ি; দক্ষিণখোলা দোতলার এক প্রশস্ত ঘরে বাস। আলো বাতাস যুক্ত এমন ঘরে থাকার একটা আলাদা আনন্দ আছে। তার ওপর প্রায় সারাক্ষণ মুকুন্দর সাহচর্য, সুন্দর উন্নত পরিচ্ছন্ন চরিত্রের এমন একটি ছেলের সংগ—সব মিলিয়ে টালিগঞ্জের এই রাউত নগর কলোনির বসবাস আমাকে জীবন-সম্পদের আশ্চর্য এক লুকানো খনির সন্ধান এনে দিলে।

মুকুন্দ ধনীর সন্তান, গত কয়েক বছর হলো সে পিতৃহীন হয়েছে। বিরাট এক সম্পত্তির মালিক হয়েও তার মতো অমায়িক উপকারী নিরীহ মানুষ আমি এখনো পর্যন্ত খুব কম দেখেছি। দৈহিক পংগুত্বের

খেসারত হিসেবে বোধ হয় মনের এই কল্পনাতীত শুভ্র নির্মলতা। দেহ তার বিশ্রী, তাই কি তার মন এমন সুন্দর ?

পাশাপাশি দুটো ঘরে আমরা থাকতাম। মুকুন্দ গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনেক রাত অবধি পড়াশুনা করতো। আমি কোনদিনই রাত জাগতে পারতাম না। লো ব্লাডপ্রেসারের রোগীর মতো বিছানা দেখলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হতো। মুকুন্দ পড়ছে, নিয়মিত পড়ার ফলে সে জ্ঞানলাভ করছে, দশের দেশের একজন হচ্ছে,—এ জিনিষ দেখেও আমার কোনোরকম পাঠস্পৃহা ছিল না, নিদ্রার প্রতি বরং বেশী আসক্ত হয়ে পড়তাম !

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘরে—মানে মুকুন্দের ঘরে যেন কথোপকথনের শব্দ শুনতে পেলাম। রাত প্রায় একটা কি দেড়টা হবে। অঘ্রানের হিমেল রাত, কুয়াশার একটা ঘন আস্তরণে আকাশ বাতাস মোড়া। এত রাত্রে—মুকুন্দের ঘরে কে আসবে কথাবার্তা বলতে ? প্রথমটা কিছু মনে করতে পারি নি। ভাবলাম বুঝি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু পরক্ষণে চুড়ির আওয়াজ শুনে বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। মেয়ের হাতের চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ—আশ্চর্য ত'! তৎক্ষণাৎ ঘুমের ঘোর কেটে গেল। কান পেতে রইলাম। হ্যাঁ; নারীকণ্ঠের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কি যে বলছে—তা সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। চাপা কান্নার সংগে মেয়েটি যেন নিজের দুঃখ বেদনার কথা বলছে। কিছু করুণ প্রার্থনা করছে। মনে হলো যেন আত্মহত্যার কথাও বললে।—যদি তাকে সাহায্য করা না হয়, তাহলে সে নিজের জীবনাবসান ঘটাবে। কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না—আচ্ছন্ন ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্টতার প্রলেপেই যেন নারীকণ্ঠের উক্তিগুলি হারিয়ে গেল।

নির্জন রাত্রে একটি কথাও আমি বুঝতে পারলাম না—তবে ওর জবাবে মেয়েটি যে তৃপ্ত হয়েছে—তা মনে হলো না। মুকুন্দ কথা বলার চেয়ে

ইশারাতেই বোধ হয় বেশী প্রকাশ করছে নিজেকে, কিন্তু মেয়েটি ক্রমেই উচ্ছ্বাসে, বেদনার প্রকাশে যেন ফেটে পড়ছে। উত্তাল সমুদ্রের অধীর তটরেখায় উচ্ছল তরংগ সংক্ষোভ যেমন করে ভেঙে ভেঙে পড়ে, মেয়েটির চাপা কান্নার শব্দিত প্রকাশ কতকটা সেই রকম। কল্পনার চোখে যেন দেখতে পেলাম মেয়েটি ফুলে ফুলে কেঁদে উঠছে।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেটা যথাস্থানে উল্লেখ করা উচিত ছিল, কিন্তু মনে পড়ে নি। কয়েকদিন আগে আমি ল্যান্সডাউন রোডে শিবেনের বাড়িতে সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ গিয়ে পড়ি। শিবেনের ঘরে ঢোকার আমার ঢালা অনুমতি ছিল। সরাসরি সেখানে গিয়ে দেখি মুকুন্দ রয়েছে—তীব্রভাবে শিবেনকে তিরস্কার করছে। ভাষা বেশ উগ্র আর কটু। মুকুন্দর ও রকম অগ্নিমূর্তি এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। শিবেনের মতো এরকম বিশিষ্ট একজন সুপুরুষ, খেলাধূলোর জগতে যে প্রায়ই দিগ্বিজয়ী বীর, সে অসহায়ভাবে কাঁচুমাচু হয়ে মুকুন্দের সামনে কুণ্ঠায় সংকোচে ম্রিয়মাণ হয়ে বসে রয়েছে, নির্যাতনের লজ্জায় তার কপাল কপোল—সব রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। শিবেনকেও এমনভাবে ক্ষুব্ধ অপমানের ভারে নুয়ে পড়তে কখনো দেখিনি।

আমি শিবেনের ঘরে ঢোকার সময় মুকুন্দর গলা শুনলাম—সে রূঢ়ভাবে ধমক দিচ্ছে—আমি বিশবার অন্তত তোকে বারণ করেছি, শাসন করেছি, তবু আমার নিষেধ শুনবি না। জানোয়ারের চেহারা থেকে মানুষ যেমন সরে এসেছে, তেমনি পশুর মনোবৃত্তিও দূরে ফেলে দিয়েছে। এটা কি নতুন করে তোকে দেখতে হবে নাকি?

সে সময় আমার আগমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। আমি ঢোকামাত্রই ঘরের আবহাওয়ার যেন একটু বদল হলো বলে মনে হলো। রুদ্ররূপী সূর্যের অবিরাম এবং প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণের মুখে স্বল্পায়তনের একখণ্ড লঘু মেঘ এলে যেমন তরল একটা আবরণের ক্ষণকালস্থায়ী ছেদ পড়ে,

এ যেন তেমনি এক নিমেষকালের বিরতি। শিবেনের সমস্ত রূপ সৌন্দর্য যেন ঐ বিকৃত খর্বকায় মুকুন্দের অসন্তোষের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। মুকুন্দ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে, ক্রোধে উত্তেজনায় আবেগে মুকুন্দের শরীর কাঁপছে। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দুটো চোখ যেন সত্যিই জ্বলছে মুকুন্দের। শান্ত সুধী স্নিগ্ধ চরিত্রের এই মুকুন্দ যে এমন রূঢ় বীভৎস হতে পারে— তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণা যে কত মিথ্যা—তা এখন টের পেলাম। এ আমি কি দেখছি?

ঘরে ঢুকেই আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। বুঝলাম সে সময় ওদের মধ্যে আমার গিয়ে পড়াটা বোধ হয় ভালো হয়নি। আমি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে সে কথা বলে ফেললাম।

মুকুন্দ বললে—হ্যাঁ, যদি খুব জরুরী দরকার না থাকে, তাহলে এখন তুই যা ফল্টু। পরে আসিস। আমরা একটা বিশেষ ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। যা—

শেষের দিকে মুকুন্দের কণ্ঠে একটু ক্রোধের প্রকাশও ঘটলো।

আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এলাম। মুকুন্দের ধমকটা সহজে জীর্ণ হলো না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাতাস ছিল না, কেমন যেন গুমোট ভাব। আকাশে বিশ্রী রকমের পাংশুবর্ণের কুয়াশার একটা আস্তরণ, নীচে শহর থেকে ধোঁয়া উঠছে ঠেলে। সন্ধ্যাবধূ যেন ধোঁয়ার ফাঁস গলায় দিয়ে বিবর্ণ পোড়া এই আকাশের তলায় আত্মহত্যা করতে চাইছে। মনটা বিশ্রী লাগছিল। কি দরকার ছিল আমার অকারণে শিবেনের বাড়ী যাওয়ার?

মুকুন্দের সংগে শিবেনের একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু কী সেটা— তার রহস্য ভেদ করতে পারলাম না। খেলাকেও আর আমরা দেখতে পেলাম না। কোথায় যে খেলা উধাও হলো—তাও কেউ জানলো না, কর্পূরের মতো উবে গেল নাকি?

সেদিন সন্ধ্যায় এদিকে-ওদিকে কিছুক্ষণ ঘুরে রাউত নগরে ফিরলাম। মুকুন্দ রাগতভাবে শিবেনের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে ত'

অভিমান করে ওর বাড়ির আশ্রয় ছাড়তে পারি না। আমি অমন অসময়ে ওদের আলোচনার মধ্যে না গেলেও পারতাম।

প্রায় রাত ন'টা আন্দাজ নিতান্ত সাধারণভাবে বিনীত হাসির ঝিলিক মুখে নিয়ে মুকুন্দ আমার কাছে এসে বললে—আজ বিকেলের ব্যবহারে খুব আশ্চর্য হয়েছিস বোধ হয়। কি রে, কথা বলছিস না? ভাবছিস মুকুন্দটা কি রকম অভদ্র,—তোকে তাড়িয়ে দিলাম!

আমি একটু নরম স্বরে বললাম—আমারই ত' যাওয়া উচিত হয় নি। অসময়ে গিয়ে পড়েছিলাম—

মুকুন্দ বললে—সময় অসময়ের কিছু ব্যাপার নয়, একান্ত গোপনীয় কোনো ঘটনা সম্পর্কে আমি শিবেনকে সাবধান করছিলাম। তোকে সব বলা যায় না তাই তুই বুঝতে পারবি না—আর তোর সামনেও অমনভাবে কাউকে বকা চলে না। তাছাড়া, তোর ওপর আমার একটা স্নেহের দাবিও ত' আছে—তাই তোকেই বকে তাড়িয়ে দিলাম। বলতে বলতে মুকুন্দের কণ্ঠ কেঁপে গেল।

ভারি আশ্চর্য লাগলো, স্নেহময় একটা ব্যক্তিত্ব মুকুন্দের ভেতরের সেই ক্রুদ্ধ চণ্ডালটাকে কোথায় সরিয়ে দিয়েছে। শুধু মুকুন্দের গলা ভিজে উঠলো না, আমারও চোখ ছলছল করে এল! মনে হলো বিকেলের প্রসংগ না উঠলেই ভালো হতো, তবু মুকুন্দ একটা কৈফিয়ত দিচ্ছে তার ব্যবহারের। কিন্তু আমার যা জানতে ইচ্ছা তা সে বলবে না, শিবেনকে ও কেন বকেছিল—তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কিছুতেই উত্তর পাওয়া যাবে না—তাই চুপ করে গেলাম। মুকুন্দই বলতে লাগলো—শিবেনকে মাঝে মাঝে আমি ওরকম ধমকাই। সামনে টেস্ট পরীক্ষা—জানিস ত'?

পরীক্ষার জন্যে শিবেনকে তিরস্কার করেছে মুকুন্দ? বিশ্বাস হলো না, তবু তার কথায় সায় দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—পরীক্ষায় তুমি বোধ হয় খুব সাহায্য করো শিবেনকে—না? আমি ত সে রকম শুনেছি। তোমার সাহায্য না পেলে শিবেনের পরীক্ষায় পাশ করাই নাকি শক্ত হতো।

সাহায্য মানে? স্কুল থেকে কে তাকে চালিয়ে নিয়ে আসছে? স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায়, ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষায়—সব সময়ই নীতি ধর্ম বিসর্জন দিয়ে অমানুষিকভাবে কে সাহায্য করেছে শুনি? যদি আমি ওর পেছনে না থাকতাম, শিবেন জীবনে কলেজের মুখ দেখতে পেত? আর—এই পর্যন্ত বলে মুকুন্দ একটু থামলে। অস্থির গাম্ভীর্যের একটা ছায়া তার মুখে এসে পড়েছে। মনের মধ্যে একটা তোলপাড় চলছে মনে হলো।

আর কি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আশা করেছিলাম বোধ হয় খেলার ব্যাপারে কিছু বলবে। কিন্তু মুকুন্দ সে ধার দিয়েও ঘেঁষলো না।

সে বলতে লাগলো—আর কি জানিস, শিবেন যে আজ বক্তা হিসেবেও একটু-আধটু পরিচিতি পেয়েছে—তার মূলেও জানবি এই শর্মা। ও যে এখন জায়গায় জায়গায় বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে, ছোট খাটো ধরনের ট্রফি-খেলার ফাইনালের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার দিতে গিয়ে চোখা চোখা কথা বলছে—ও কার কথা? খেলাধুলো সম্পর্কে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ,' 'দেশ', আনন্দবাজার', 'বসুমতী', 'যুগান্তর'-এ যে প্রায়ই লিখছে শিবেন—ও কার লেখা?

মুকুন্দ যে নেপথ্য থেকে শিবেনকে এত দূর সফল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছে—এত বড় স্বার্থত্যাগী শিল্পী সে—তা আমি জানতাম না। আমি মুকুন্দর কথা শুনে প্রায় হতবাক্ হয়ে পড়লাম। শিবেনের গৌরবে আমরা সবাই উদ্দীপ্ত ছিলাম, কিন্তু তার পেছনে মুকুন্দের যে এতটা নীরব সাধনা রয়েছে—তা কোনদিন জানতে পারিনি।

মুকুন্দ বলতে লাগলো—কে তাকে বক্তৃতা করতে শিখিয়েছে? বাক্যের কোন্ কথাটা কোথায় কখন জোর দিয়ে বলতে হয়, আর কতটা জোর দিতে হয়, এবং কি ভাবে থামতে হয়—তা পর্যন্ত বলে দিয়েছে কে? কি করে হাসতে হয়, কোন্ কথার কী জবাব দিতে হয়, কোন্ সময় বা দু'কাঁধ ঈষৎ উঁচু করে একটু ঝাঁকি দিতে হয়—এসব কে তাকে শিখিয়েছে?

মুকুন্দ বলে কি? স্বার্থের পরিমণ্ডল রচনা করে আমরা সেই বৃত্তটুকুর মধ্যে কলুর বলদের মতো ঘুরি, এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কিছু উচ্চাংগের দার্শনিক বাণী আবৃত্তি করি। কিন্তু স্বার্থকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে বন্ধুকে তৈরী করার জন্যে, বন্ধুকে মানুষ করার উদ্দেশ্যে নিজের সময় এবং মনোযোগ অকাতরে ব্যয় করে মুকুন্দ একি উদাহরণ আমাদের সামনে স্থাপিত করছে? ধীরে ধীরে শিবেনকে গড়ে তোলার সাধনায় মুকুন্দের এ কোন্ আনন্দ?

মৃৎশিল্পী যেমন করে মূর্তি রচনা করে, গায়ক যেমন করে গানের সুর দিয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে, চিত্রকর তুলির দ্বারা যেমন দৃশ্য এঁকে তাতে সুন্দরকে ধরে—তেমনি করেই যেন মুকুন্দ শিবেনকে রচনা করছে, অন্ততঃ মুকুন্দের কণ্ঠের এই আবেগে সেই সত্যটুকুই ধ্বনিত হচ্ছে বলে মনে হলো।

তবে আমি স্বার্থান্ধ জীব। তাই আমি বারবার ভাবতে চেষ্টা করলাম—মুকুন্দের এতে কোন স্বার্থ আছে কিনা। কেন সে শিবেনের প্রতি এই অকৃপণ করুণা বর্ষণ করেছে? কেন? সে কি খেলাকে পাবার জন্যে? কিন্তু খেলা শিবেনের কাছে আসার আগেই ত' দেখা যাচ্ছে শিবেন মুকুন্দের আশীর্বাদে প্রসন্ন হতে পেরেছে। খেলার সংগে পরিচয়ের বহু পূর্বেই ত' মুকুন্দ শিবেনকে নিজের মতো করে নির্মাণ করতে শুরু করেছে! পৃথিবী বড় বিচিত্র জায়গা! তার চেয়েও বিচিত্র হলো মানুষের মন।

আজ বুঝলাম ভবানীপুর সাধারণ ইলেক্‌শনের কি-একটা জরুরী মিটিঙে শিবেন পুরকাইতের বক্তৃতায় লোক যে মুগ্ধ হয়ে তাকে ধন্য ধন্য করেছিল—সেই ভাষণের স্রষ্টা কে। রাজনৈতিক সমস্যার কয়েকটি দিক দিয়ে নাকি সে অদ্ভুত সুন্দর আলোচনা করেছিল। সে আলোচনা যেমন মৌলিক, তেমন মনোজ্ঞ।

মুকুন্দ বললে—তাই, যখন বেচাল হ'য়ে যায় ঘুঁটি, শিবেন যখন বিগড়ে যায়, একটু ধমকাতে হয়। বল্টু আল্‌গা হলে দু-একটা প্যাঁচ কষে শক্ত করতে হয়। চাবুক না মারলে ঘোড়া সায়েস্তা হবে কেন?

সামান্য একটা কথা বোঝাতে—মুকুন্দের কথার কি সাজ-পোশাক! কখনো-সখনো মুকুন্দ এই রকম অলংকার দিয়ে সাজানো কথা বলতো। শিবেনকে এই পদ্ধতিটা শেখাবার পর থেকে মুকুন্দ সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য বলতো। তাকে বলতে শুনেছি—শিবেনের কথায় অলংকার আছে, সাজ-পোষাক আছে, বক্তৃতার ঢঙ আছে—আর এসব আছে বলেই আমাদের উচিত অন্য পদ্ধতিতে কথা বলা; তবেই ত' আমাদের বৈশিষ্ট্য থাকবে। আমি নিজে অলংকৃত বাক্য বলতে পারি, কিন্তু শিবেনের জন্যে তা ত্যাগ:করেছি।

মুকুন্দ সেদিন আরো হু'চারটে কথা বলেছিল—শিবেনকে গড়ার জন্যে তার অধ্যবসায়ের কিছু পরিচয় দিতে সে নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লো।

বিকেলের ঘটনায় আমি মর্মাহত হয়েছিলাম তাই এসব ফিরিস্তি শুনতে খুব বেশী বাসনা ছিল না, বেদনাহত মন নিয়ে ফিরে এসেছি। কিছুটা অপমানবোধও যে না হয়েছে—এমন নয়, তাই ও প্রসংগটা চেপে যাওয়াই ভালো।

হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম।

এই ঘটনারই কিছুদিন পরে অঘ্রানের ওই রাত্রে মুকুন্দের ঘরে নারীর চাপা কান্নায় ভেজা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কি কথা হলো জানি না এমন কি মুকুন্দ যা বললে—তাতে মেয়েটি একটুও তৃপ্ত হলো কিনা জানি না, মুকুন্দের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। দরজার কাছে ওরা বোধ হয় একটু দাঁড়িয়েছিল—তার পর ঘর থেকে হুজনের বেরিয়ে যাওয়ার পদধ্বনি শুনলাম। মুকুন্দের গতিভংগীর সংগে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, থপ্ থপ্ করে চলার শব্দে দূর থেকেই বোঝা যেত মুকুন্দ পথ হাঁটছে।

এখন বুঝতে বাকী রইলো না যে ওই মেয়েটির সংগে মুকুন্দ যাচ্ছে। এই রকম নিশুতি রাতে মুকুন্দের ঘরে কোনো মেয়ের যাওয়া আসার মানে কী—তা বুঝতে বাকি ছিল না; মুকুন্দকে ভালভাবে জানি, তাই

বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু এই রাত্রে এই ঘটনার পর মুকুন্দ সম্বন্ধে লোকে কী ভাববে?

মিনিট কয়েক পরে মুকুন্দ একা ফিরে এল বলেই বোধ হল। সিঁড়ি দিয়ে নামার আর ওঠার শব্দে বুঝলাম মেয়েটিকে সদর দরজার বাইরে বের করে দিয়ে এল! সে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বোধ হয় মিনিটখানেক চেপে বসলো খাটের ওপর। তারপর উঠে দাঁড়াল বলে মনে হল।

মুকুন্দের ঘর থেকে আমার ঘরে আসবার জন্যে ভেতরের একটা দরজা ছিল। মুকুন্দ মেয়েটিকে সদর দরজা পার করে দিয়ে ফিরে এসে, কিছু পরে আমার ঘরের দরজাটা খুললে। বাতি নেভানো ছিল, দরজা খুলেই মুকুন্দ বিছানায় আমার মুখ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললে। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

মুকুন্দ কিছুটা অবাক হল,—বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—তুই এতক্ষণ জেগে ছিলি ফল্টু?

হ্যাঁ—মানে, কার যেন ফোঁপানো কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি, তারপর স্পষ্ট শুনলাম পাশের ঘরে—

হ্যাঁ—ঠিকই শুনেছিস।—বলতে বলতে মুকুন্দ আমার বিছানার একপাশে এসে বসলো, খুব নরম আর নীচু গলায় বললে—খেলা এসেছিল।

খেলা? নামটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। মুকুন্দের ঘরে এই নির্জন নিশুতি রাতে খেলা এসেছিল! অভাবিতপূর্ব একটা জৈব বেদনায় সমস্ত প্রাণমন টনটন করে উঠলো। খেলা এসেছে এখানে,—এই রাউতনগরে!

কিন্তু কেন জানিস? মুকুন্দ বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরে প্রশ্ন করলে।

কেন? আমি বোকার মতো প্রশ্ন করলাম।

শীগ্‌গিরই খেলার ছেলেপিলে হবে—সে বেশ বিপদে পড়েছে। তাই আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে।—খুব সাধারণভাবেই মুকুন্দ বললে।

খেলা—মানে আমাদের সহপাঠিনী, কুমারী মেয়ে, সে সন্তান-প্রসবা? ব্যাপারটা শুচি নয়, বিকৃত রুচির। মুকুন্দ এ-কথাটা এত সহজে কি করে আমাকে বলতে পারলে? প্রথমটা আমি বিস্ময়াবিষ্ট হলেও সম্বিৎ ফিরতে আমার দেরী হলো না।

তা, ভূ-ভারতে এত লোক থাকতে বেছে বেছে তোমার কাছেই বা সাহায্য চাইতে এল কেন? মনে হলো এই প্রশ্ন করি, কিন্তু খেলা-সম্পর্কিত ঘটনা ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠছে। খেলার কুমারী-জীবনে অবশ্যই এ এক কলংকিত অধ্যায়। এ নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করা ভালো নয়! অকারণে যত্র তত্র কেঁচো খোঁড়ার মূঢ়তা আমার নেই। তবে আমি মনে মনে একটু বিশ্বাস করতাম যে মুকুন্দের সংগে খেলার তেমন কোন সম্পর্ক ঘটেনি যাতে খেলাকে এইরকম অপমানকর অবস্থার সামনে দাঁড়াতে হয়। সে-বিষয়ে মুকুন্দ নিজে থেকে আমাকে কিছু জানালে, মুকুন্দ সম্পর্কে আমার ধারণাটা ঠিক থাকে।

মুকুন্দ যেন আমার মন বুঝতে পেরেছে, এমনভাবে সে বললে—খেলা আমার কাছে কেন এসেছে জানিস? সে এই বিপদে কার কাছে যাবে ভেবে পাচ্ছে না। কেন জানি না ওর মনে হয়েছে, সারা কলেজের মধ্যে আমিই যেন সকলের ত্রাণকর্তা। যার যা বিপদ হোক না কেন, তাকে সে-বিপদ থেকে আমি রক্ষা করে থাকি। এই বিশ্বাস আর ভরসা নিয়ে খেলা কুমারী-জীবনের সবচেয়ে চরম বিপদের দিনে আমার শরণ নিয়েছে। তা ছাড়া আর একটা কারণও আছে।

আর একটা কি কারণ—তা আর আমার জানতে ইচ্ছে হলো না। খেলার প্রতি এককালে আমার দুর্বলতা ছিল, কিন্তু এইরকম নোংরা ব্যাপারে মনটা কেমন যেন বিষিয়ে গেল। খেলা এসেছিল মুকুন্দের কাছে—এবং খেলা মুশকিলে পড়েছে—আর মুশকিলটা কোন্ জাতীয়—এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট, এই নাটকের নায়ক কে—তা জানবার স্পৃহা আমার ছিল না। ভীরুতা কিম্বা ঘৃণা—কি জন্যে জানি না খেলার প্রতি আসক্তি আমার মুহূর্তের মধ্যে কর্পূরের মতো

উবে গেছে। হয়তো আঙুর ফল টক ভেবেই অপ্রাপ্যতার চাতুর্যকে নিয়ে খুসী হলাম।

মুকুন্দ ছাড়বে কেন? আর একটা কি কারণে মুকুন্দের কাছে খেলা এসেছে—তা সে শোনাবেই। সে বললে—জানিস, হতভাগা শিবেনটা এর মধ্যে জড়িত আছে।

তার মানে? মানে আমার পক্ষে বোঝা উচিত ছিল,—তবু হঠাৎ মুখ থেকে এই প্রশ্নটা খসে পড়লো।

মানে খুব সোজা। খেলার সংগে শিবেনের অবাধ মেলামেশার যা অনিবার্য ফল তাই ফলেছে। রাস্কেলটাকে কত নিষেধ করেছিলাম। মুকুন্দের মুখে ঘৃণা ফুটে উঠলো। ঐ রকম কুৎসিত চেহারার মানুষের মুখে এই ঘৃণা সাংঘাতিক ভয়ংকর ঠেকে।

এখন উপায়? ঈষৎ ভয়ের সংগেই জিজ্ঞাসা করলাম।

খেলার ইচ্ছে শিবেন ওকে বিয়ে করে। তাহলে মেয়েটির সব দিক বাঁচে।

শিবেন কি বললে?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

শিবেন আবার বোলবে কি? ও এই ফ্লার্ট-মেয়েটাকে বিয়ে করলে ওর সব-কিছু নষ্ট হবে। ও একটা কেরিয়ার করতে চলেছে। খেলোয়াড় হিসেবে, সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ হিসেবে ওর একটা খ্যাতি ভারতবর্ষময় ছড়িয়েছে, তার ওপর নানা জায়গায় নানা দিকে ক্রমে ক্রমে ওর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, কত জায়গা থেকে ওর ডাক আসছে—এই সময় একটা কলংকময় বিয়েতে ওকে আমি কিছুতেই জড়াতে দেব না। শিবেনের যে খুব একটা অনিচ্ছা আছে—এ-বিয়েতে, তা নয়। কিন্তু আমি মত না দিলে ত' সে আর বিয়ে করতে পারে না।

কিন্তু—মেয়েটার কি হবে? সংকোচের সংগে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

খেলার কি হবে তা চট করে বলতে পারছি না, তবে এটা ঠিক যে শিবেনের ওকে বিয়ে করা চলবে না। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। যাক্‌গে সে-কথা। তোকে যে এসব কথা বললাম—এ খুব

গোপনীয় কথা। খবরদার—কাউকে যেন বলিসনি। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। অন্ততঃ শিবেনের ভবিষ্যৎ জীবন। খেয়াল রাখিস।

আমি সত্য করলাম যে আমার মুখ থেকে এ খবর আর কারুর কানে পৌঁছবে না।

এর পর মুকুন্দ নিজের ঘরে চলে গেল। মনটা তার দেখলাম কেমন যেন ভার-ভার। আমি অকারণ বিষণ্ণ বোধ করলাম। এক এক সময় এমন হয় কোন কারণ নেই, মনটা বেদনায় দুমড়ে থাকে।

খেলাকে নিয়েই তা হলে এতদিন শিবেন আর মুকুন্দের মধ্যে কথার বিবাদ চলছিল। একটি মেয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দুজনের এমন সুগভীর বন্ধুত্বে ফাটল ধরিয়েছিল।

আবার ব্যাপারটা এমন নাও হতে পারে, খেলা বা শিবেনের মুখে এই ঘটনার বিষয় অন্যরকম কথা শোনা যাবে।

তবু মুকুন্দের কথা ঠিক,—এই ধরে নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম শিবেনের অধঃপতনটা কতদূর। মুকুন্দের মতো বন্ধু পেয়েছে সে, দায়ে-অদায়ে সব সময় তাকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার নিষেধ-বাণী না শুনে খেলাকে নিয়ে এ তার কি-এক উন্মত্ত খেলা?

খেলাই বা কেমন মেয়ে, নিজের মনে কোন জোর নেই; আত্মশক্তির তেজে নিজেকে সে পবিত্র রাখতে পারলো না!

খেলা সম্পর্কে বোধ হয় তখনো আমার মনে একটা মমত্ববোধ এক-আধবার উঁকি দিত। ভয়ে বা ঘৃণায় সংকুচিত হলেও একটু-আধটু দয়া জাগতো কখনো-সখনো। তাই এক একবার এমনও মনে হয়েছে যে খেলার এই ঝঞ্ঝাট খেলার দোষে যতটা না ঘটেছে, অন্যে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘটিয়েছে। আচ্ছা এটা যে শিবেনের অপকর্ম তা নাও হতে পারে। আচ্ছা, এর পেছনে মুকুন্দের কোনো কৃতিত্ব নেই ত'? সরাসরি একবার খেলাকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়?

খেলা ত' কলেজে প্রথমে আমার সংগেই হেসে কথা বলেছে, আর আমিই বোধ হয় প্রথম ভাগ্যবান্ যে খেলাকে সবচেয়ে আগে প্রথম ডাকের সংগেই 'তুমি' সম্বোধন করে নিবিড় সান্নিধ্য আর মাধুর্যের একটা পরিমণ্ডল গড়ে নিয়েছিল। সে সব অতীতের কথা, সে স্মৃতি এখন মুছে গেছে। ইদানীং খেলা আমাকে এড়িয়ে চলতো, আমিও কাঙাল দৃষ্টির আতুরতা যে আমার পক্ষে অপমানকর—এ কথা ভেবে খেলার প্রতি নিরাসক্তির ঔদাসীন্য বজায় রেখে চলতাম। আমার দুই বন্ধু—শিবেন আর মুকুন্দ সেই খেলাকে নিয়ে জড়িয়েছে, আমাকে সেই জটিলতার কথা শুনতে হয় বলে মনটা এক আধবার ঈষৎ দুলে ওঠে। আঘাত সেরে গেলেও কাটা জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন সহসা মেলায় না, সেখানে কোনো প্রতিবেদন জাগলে যে আঘাতের স্মৃতিতে সুর বেজে ওঠে!

মুকুন্দকে বলেছিলাম খেলার এই বিপত্তির কথা কাউকে বলবো না। এক-আধবার শিবেনের সংগে দেখা হলে একটা দুর্নিবার জিজ্ঞাসা বুক ঠেলে মুখে এসেছে—খেলার এই বিপত্তির মূল কোথায় জেনে নিই,—তবু ঠোঁটের বেড়াজালে সে-প্রশ্নকে আটকে রেখেছি। শিবেন না মুকুন্দ—কে নাটের গুরু, এই কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠলেও কষ্ট করে তা চেপেছি।

শিবেনই বরং বলেছে—বড় ঝঞ্ঝাটে আছি ফল্টু। ফুটবল শেষ হলো ত' ক্রিকেট, ক্রিকেট গেল ত' হকি! আর পারি না! তার ওপর এখন আবার দেশের কাজ, দশের কাজ।

দেশনেতা হতে চলেছ তুমি, তোমার মুখে এ-কথা শোভা পায় না, শিবেন। তাছাড়া, সকলের কাজে মত্ত হতে গেলে সে-কাজগুলিকে ঝঞ্ঝাট বা জঞ্জাল ভাবলে চলবে কেন?

আড়াল থেকে মুকুন্দ আমার দু-একটি কথা কখনো-সখনো শুনতো,—সে-কথার খেই ধরে সে হয়তো বলতো—বা রে ফল্টু,

বেশ ত' কথা বলতে শিখেছিস! এই এক বছরেই তোর উন্নতি হয়েছে।

শিবেন আমাকে একদিন ডেকে বললে—কল্টু, আমার ত টেস্ট্ পরীক্ষা এসে পড়েছে। পাস-ই করি আর ফেল্-ই করি—মুকুন্দ আমাকে এ কলেজে আর পড়তে দেবে না। আমারও ইচ্ছে নয়—এ গোয়ালে আবার ঢুকি। খেলা রইলো। অন্ততঃ বছর খানেক আরো ত' ও এখানে থাকবে—তোর হেপাজতেই রেখে যাবো—কেমন?

একবার খেলা সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্যে অধীর হয়ে উঠলাম, কিন্তু মুকুন্দর কাছে কথা দিয়েছি—আমি এ-বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করবো না। নিজের কৌতূহল প্রতিবারের মতো দমন করে সে-যাত্রা বেঁচে গেলাম।

কিন্তু খেলার কি হলো? তাকে যে আর দেখতে পাচ্ছি না। সেকেণ্ড ইয়ারের টেস্ট্ পরীক্ষার জন্যে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস বন্ধ। কিন্তু পথে ঘাটে, লেকে বা ল্যান্সডাউন রোডে প্রায়ই ত' দেখতাম খেলাকে। এখন হাজার ইচ্ছে সত্ত্বেও তাকে আর কোথাও দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আগেও বলেছি, আবার বলছি—খেলা সম্পর্কে আমার এখনো কেমন যেন করুণা জাগে। কখনো বা ঘৃণা, কখনো বা মমতা। একটা মিশ্র অনুভূতির আবেগ আমাকে বড় আকুল করে তুললো।

খেলার জন্যে আমার কেমন যেন একটু মন-কেমন করা বেদনা জমেছিল মনের তলায়। ঘৃণা বা ভয়—এমনকি বিতৃষ্ণায় সেটুকু মরেনি। তাকে নিয়ে একটা রহস্যময় পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয়েছে—তবে সমাধানের-জন্যেও একটা প্রচ্ছন্ন কৌতূহল আর উদ্বেগ আমাকে পীড়িত করছিল।

যতই আমার সুপ্ত বেদনার জন্যে আমি অধীর উদ্বেগে কাতর হতে লাগলাম, ততই আমার কাছ থেকে, আমার জ্ঞানের ত্রিসীমানা থেকে যেন খেলা লুপ্ত হয়ে গেল। কোথায় সে গেল—কেউ তা বলতে পারে না। যে খেলা ছিল খেলোয়াড় মেয়ে, যুবকমহলে সকলের ঠোঁটে ঠোঁটে আলোচ্য হয়েছিল যে, সেই খেলার এরকম আকস্মিক অন্তর্ধানে কেউ ঈষৎ বিস্ময় পর্যন্ত বোধ করলো না। আশ্চর্য!

সেকেণ্ড ইয়ারের টেস্টের'পর আমাদের পরীক্ষা হলো। তারপর মাসখানেক ক্লাস হতে-না-হতেই আই.এ. পরীক্ষার জন্যে কলেজ বন্ধ হয়ে গেল, খেলা তখনো কলেজে আসেনি।

আই.এ. পরীক্ষার পর আমার আবার এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। মুকুন্দ শিবেনকে নিয়ে কাশ্মীর যাচ্ছে বেড়াতে। ওদের তিন মাস ছুটি। অথচ আমাদের কলেজ খোলা, ক্লাস হবে, সুতরাং আমার পক্ষে ওদের সংগে যাওয়া চলবে না। বাবা চান না ক্লাসে আমি কখনো অনুপস্থিত থাকি। আর ক্লাসে বসে থেকে থেকে আমারও কেমন যেন ক্লাসে হাজরে দেওয়ার বাতিক হয়ে উঠেছে।

শিবেন কাশ্মীর যেতে চায়নি, কলেজের পরীক্ষার পর তার হকির মরসুম। মুকুন্দ গম্ভীর ভাবে হুকুম করেছে—তোর কোনো ওজর শুনবো না, তোকে আমার সংগে যেতে হবে। মোট কথা, কোলকাতার বাইরে তোকে যেতে হবে।

শিবেন বললে—আমার হকি-খেলা রয়েছে—মাদ্রাজে কিম্বা হায়দ্রাবাদে এ বছর জাতীয় প্রতিযোগিতা হবে—সেখানে যেতে হবে।

নিশ্চয়ই যাবি সেখানে। কোলকাতার বাইরেই তোকে রাখতে চাই। আমি বলছি—ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট, তোকে যেতে হবে। তোর খেলার জন্যে আমি ভাববো! আর তুই শুধু আমার কথামতো চল্‌বি—বাস্‌। মুকুন্দের কণ্ঠে আদেশের ঝাঁঝ ফুটে ওঠে।

শিবেন মুকুন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল; বললে—খেলার জন্যে তাহলে শুধু আমি একা ভাবছি না!

চটে উঠলো মুকুন্দ—এখনো সেই খেলা! খেলা মেয়েটাই তোকে খেয়েছে! এই খেলার জন্যে তোর সত্যিকার খেলাও ঘুচে যাবে। তোকে সর্তক হতে হবে। মন থেকে মুছে ফেল ওই সব বাজে চিন্তা। আগুন নিয়ে খেলতে যাস নি, নিজে পুড়ে মরবি। খেলার কথা তোকে ভুলতে হবে—এই আমার আদেশ!

শিবেন চুপ করে গেল। রেগে উঠলে দুজনের কথা কাটাকাটিতে কিছু হয়তো জানতে পারতাম; কিন্তু তা আর হলো না!

মুকুন্দ যাবার আগেই ওদের রাউত-নগরের বাড়ীতে আমার থাকার সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিলে। আমাকে বললে—কিছু অসুবিধে হবে না, ফল্টু। সারনাথ রইলো, রেঁধে-বেড়ে দেবে, যখন যা দরকার হবে, ওকে বলবি, ও সব ঠিক করে দেবে। বড় বিশ্বাসী লোক, বাবার আমল থেকে আছে।

মুকুন্দের বাড়ীটা বড়, সেখানে আমার একা থাকার ভয়ে আমি কাতর হবো—তা নয়, কেমন যেন অশোভন ঠেকতে লাগলো। মুকুন্দ নেই—অথচ আমি থাকবো—সেটা আমার পক্ষে ভালো ঠেকলো না। হয়তো লোকচক্ষে আমার ইন্‌ফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স আছে বলে প্রমাণ হবে, তা জানি, তবু চক্ষুলজ্জাটা আমার একটু বেশী বলে অন্তত আমি নিজে একটা মূঢ় সান্ত্বনা পেলাম।

আজ ওয়ালটেয়ার আপ্‌ল্যাণ্ডের মামিডি-পল্লীতে বসে এত স্পষ্ট আর পুঙ্খানুপুঙ্খ করে স্মৃতির এক বিস্তৃত অধ্যায় উন্মুক্ত করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মনের মধ্যে এই স্মৃতির গভীর উৎপীড়ন আমাকে উত্ত্যক্ত করছিল। শিবেনকে মুকুন্দ হত্যা করেছে—সেই কৌতূহলের সেই প্রশ্ন-রহস্যের সন্তোষজনক সমাধানের জন্যেই মনে এই আকুল রোমন্থন! যে মুকুন্দ শিবেনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা করছে,

যে মুকুন্দ অসহায় দরিদ্রকে নিজের গৃহে আশ্রয় দেয়, বিপন্ন নারীকে উদ্ধার করে—সেই মুকুন্দ খুনে! এ কেমনধারা কথা?

কাশ্মীরে গিয়ে শিবেনের সংগে মুকুন্দের কিছু বিবাদ হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। খেলাকে নিয়ে ওদের মত-বিরোধ কিনা—সে সন্দেহ আজও আমার যে একেবারে ঘুচে গেছে—এমন কথা বলি না। খেলাকে কেন্দ্র করে মুকুন্দের কোনো প্রাণচাঞ্চল্য কখনো দেখিনি। আমার যেটুকু ছটফটানি ছিল খেলার জন্যে, মুকুন্দের মধ্যে সেটুকুও কখনো প্রকাশিত হতে দেখিনি। তবে মুকুন্দ যে বলতো—সমুদ্রের গভীর জলে তেমন কোনো ঢেউ নেই রে—তীরের কাছে, অগভীর জলই বেশী সোঁ সোঁ আওয়াজ করে মরে, উত্তাল হয়ে সৈকতে তরংগিত হয়ে আছড়ে পড়ে। তাই আমার মনে হয়—খেলার মোহে শিবেন ওকে নিয়ে মত্ত হয়েছে, ওর প্রেমে ডুব দেয়নি। তাই ওর চোখে এত রঙ, মনের অতলে কোনো দাগ পড়েনি, তাহলে কি শিবেন পারতো খেলার এই সর্বনাশ করতে?

এ-কথার মধ্যে খেলার প্রতি মুকুন্দের কোনো মনোবেদনার প্রচ্ছন্ন অধ্যায় আছে কিনা আজ আবার ভাবতে বসলাম। কোনদিনই মুকুন্দকে বোঝা যায় না, সাধারণ কিম্বা অসাধারণ কোনো কথাতেই সে উপমা কি রূপক ব্যবহার না করে পারে না। মনকে সে কদাচিৎ উদ্‌ঘাটিত করে—তাও উপমা দিয়ে। সুতরাং খেলার সংগে মুকুন্দের কোনো নিগূঢ় বা নিভৃত আলাপ আছে কিনা বলতে পারি না। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ বলেও হয়তো খাঁটী বিচার করতে পারছি না।

আমি কিন্তু ঐ এক রাত্রি ছাড়া খেলার সংগে মুকুন্দকে কথা বলতে কখনো দেখিনি। খেলা সম্পর্কে কোনোদিন এলোমেলো অসংলগ্ন উক্তি করতে শুনিনি। শিবেনকে খেলার হাত থেকে বাঁচাতে হবে—বরাবর এই রকম কথাই শুনতাম। তাই এক এক বার ভাবি যে খেলাকে নিয়ে এমন কোনো ঘটনা ঘটতেই পারে না—যাতে মুকুন্দ এতবড় একটা সাংঘাতিক কাজ করে বসতে পারে!

আমি রাউত-নগর থেকে চলে এসে একটা মেসে উঠলাম। ইতিমধ্যে দুটো টিউশনি পেয়েছিলাম—মুকুন্দই যোগাড় করে দিয়েছে—তাদেরই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়দের বাড়ীতে। একটু লোভনীয় সম্মানমূল্যেই অবশ্য সে-টিউশনি দুটি জুটেছে—সেজন্যেও মুকুন্দ আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছিল। এই জন্যেই মেসে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হলো।

কাশ্মীর থেকে ফিরে মুকুন্দ আমাকে তার বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। আমি আর গেলাম না ওখানে। মুকুন্দ, শিবেন—ওরা এখন বি-এ ক্লাশের ছাত্র হবে, আর আমার বরাতে কী আছে কে জানে! হয়তো আই-এ তেও দু-একবার বিশ্রাম নিতে হবে। স্কুল ফাইন্যালে যেমন এক বছর দাঁড়িয়েছি, তেমনি।

ঠিকই আঁচ করেছিলাম। মুকুন্দ আর শিবেন বি-এ ক্লাসে অন্য কলেজে ভর্তি হলো। শিবেনের ইচ্ছে ছিল পুরনো কলেজেই পড়ে, কিন্তু যার সাহায্যে সে আই-এ সমুদ্র পার হয়েছে—তার ধমক এবং অনুশাসনে অন্য কলেজে মুকুন্দের সংগেই তাকে ভর্তি হতে হলো।

আমার পরীক্ষার পড়ার চাপ পড়লো। প্রত্যহ আর ওই দুজনের সংগে দেখা করে উঠতে পারতাম না। কখনো-সখনো মুকুন্দ মেসে আসতো—এ-কথা সে-কথা হতো। মাঝে মাঝে মুকুন্দ তার নিজের জীবনের উচ্চাদর্শ আর উচ্চাকাংক্ষার কথা প্রকাশ করতো, কখনো বা শিবেনের কথা বলতো। বলতো—দেখবি, শিবেন কত বড় হবে। শিবেনকে বড় করে তোলার দায়িত্ব যখন স্বেচ্ছায় মনে মেনে নিয়েছি, তখন তার বড় না-হওয়ার মধ্যে আমার হারজিৎ নিহিত রয়েছে।

কিন্তু কেন? কেন এমন করে সাধকের ব্রত হিসেবে মুকুন্দ এই দায়িত্ব নিয়েছে? আমি ভেবে ভেবে কুলকিনারা পেতাম না। শিবেন তার কেউ নয়, আত্মীয় নয়, পরিজন নয়, শুধুমাত্র বন্ধু। তার জন্যে এ মমতা বা কর্তব্যবোধ কেন? মনে এই প্রশ্ন জাগলেও মুকুন্দের ব্যক্তিত্বের সামনে তা উল্লেখ করতে পারলাম না। আমারও অনেক

উপকার করেছে। শিবেনকে ও অনেক দিয়েছে—ঈর্ষা করি না, আমার প্রাপ্তির হিসেব কষে আমি খুসী থাকতাম!

মুকুন্দটা ত' ওইরকমই। আমিই বা ওর কে? আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আহার দিয়েছে, নিজের ভাইয়ের মতো ব্যবহার করেছে, আমার কল্যাণকেই সে বড় বলে গণ্য করেছে! পরের উপকার করার জেদের মধ্যেই বোধ হয় ওর অন্তর তৃপ্ত হয়। সব বন্ধুদের জন্যেই ত' মুকুন্দ অকৃপণ দাক্ষিণ্যে উদার হয়ে পড়ে। তবে শিবেন সম্পর্কে তার একটু বেশী দৌর্বল্য আছে।

আমি দেখেছি—শিবেনের কথা বলতেই মুকুন্দ খুশি হয় বেশী। নিজের বিকৃত চেহারার জন্যে কখনো মুকুন্দ আক্ষেপ করে নি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার কোন জেহাদ ছিল না। বরং সে সান্ত্বনা পেয়েছে এই ভেবে যে, ঈশ্বর তাকে ত' সব দিক থেকে নিঃস্ব করেন নি, তাঁর সমস্ত দান থেকে বঞ্চিত করেন নি। মুকুন্দকে অনেকবার বলতে শুনেছি—দেহের পংগুত্ব দিয়ে ঈশ্বর যে ক্ষতি করেছেন—তা তিনি যথাযথ পূরণ করেছেন মনের ঐশ্বর্য দান করে। আমার মনে পাঠস্পৃহা দিয়েছেন। মননেন্দ্রিয়ের স্বচ্ছতায় আমি আনন্দ পেয়েছি—এজন্যে ঈশ্বরকে আমি প্রণাম করি। দাতা হিসেবে ঈশ্বর সব কিছু দেন নি আমাকে, কিন্তু অনেক দিয়েছেন, গ্রহীতা হিসেবে আমি এত সব দানের মর্যাদা দিতে পারছি কই? সকলের যে সব থাকে না, ভাই—তোরা আমার এই খোঁড়া দেহটার জন্যে কেন মায়া করিস, কেন দুঃখ করিস। মন ত' আমার খর্ব নয়, খোঁড়া নয়, সে তোদের মতই পূর্ণ, সচল, সজীব।

মুকুন্দ সহজেই সব কিছু স্বীকার করে নিতে পারতো। কিন্তু ইদানীং দেখেছি, শিবেনের কথা বলতে না পারলে মুকুন্দ ভারী অস্বস্তি বোধ করতো। শিবেনের সংস্পর্শে সে খুশি হতো, শিবেনের গৌরবে সে আনন্দে স্ফীত হতো।

শিবেনও একটু একটু করে জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে নামও করেছিল। বক্তা হিসেবে তার খ্যাতি হয়েছে, খেলোয়াড় হিসেবে

তার প্রতিষ্ঠা। একে সুপুরুষ—তার ওপর সবরকম খেলাতেই তার অসাধারণ দখল। আর যে-কোনো বক্তৃতামঞ্চে উঠে সে লিখিত ভাষণ পাঠ করতো—যে ভাষণে তার দ্যুতি ও দীপ্তি ভাবুক শ্রোতাদের বাহবা দিতে বাধ্য করতো।

কোনো দলীয় স্বার্থের লেবেল এঁটে সে কখনো মঞ্চে উঠে চীৎকার করতো না। বরং সমস্ত দলেরই ত্রুটিকে সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতো। খেলোয়াড় থেকে সে রাজনীতিবিদ হতে চলেছে। সে নিজের প্রগতিপন্থী মতকেই জাহির করতো, ঘুন-ধরা সমাজের সর্বস্তরে যে-বিপর্যয়—নিঃস্বার্থ চেতনায়—তারই কারণ বিশ্লেষণ করতো। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে শিবেনকে কখনো দলীয় কথার উদ্‌গিরণ করতে আমরা শুনিনি।

কিছুদিন কাটলো। শিবেন বা মুকুন্দের কোনো খবর পেলাম না।

একদিন কাগজে দেখলাম শিবেন ভারতবর্ষের নবনির্মিত স্পোর্টস্ বোর্ডের একজন বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। অভিনন্দন জানিয়ে ওর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে চিঠি দিলাম। আমাদের শিবেন এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে গেছে—এতে গর্ব হবারই কথা। কিন্তু শিবেনের কাছ থেকে কোনো উত্তর পেলাম না।

মাঝে একবার শিবেনের সংগে দেখা। সে প্রথমটা আমাকে চিনতেই পারে নি। চেহারা যদিও আমার বিশেষ বদলায়নি, বরং বলতে পারি যে শিবেনের মনই বদলে গিয়েছিল। তাই সে প্রথম আমাকে চিনতে পারেনি। একটা দুটো সংক্ষিপ্ত কথার পর সে আমার কাছ থেকে বিদায় চাইল। বললে—একটু তাড়াতাড়ি আছে, ফন্টু, আজ চলি, কেমন? একদিন আসিস না বেড়াতে।

আচ্ছা, যাবো। তা তুই এখন সহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক, *আমাদের কি আর মনে আছে? এই ভয়ে ত' তোর ওখানে যাই* না।—আমি বললাম

শিবেন যেন কতকটা সে-কথা স্বীকার করে নিয়েই বললে—যা বলেছিস। দিনরাত লোকের ভিড়, ওর এ কাজ, তার সে-কাজ। আজ এখানে বক্তৃতা, কাল ওখানে সম্বর্ধনা, এখানে এই ফুটবল ফাইন্যালে সভাপতি, কাল ওই সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার বিচারক। তোদের সংগে যে দু'দণ্ড নিরিবিলি কথা বলবো —সে সময় পর্যন্ত নেই। আচ্ছা, আজ চলি, ফল্টু।

শিবেনের চলে যাওয়ার ভংগীর দিকে তাকিয়ে রইলাম, দেখলাম তার গতিচ্ছন্দেরও যেন একটু বদল হয়েছে, চালটা কেমন যেন আমিরী-আমিরী বোধ হলো। শিবেন নিজে থেকে মুকুন্দের কথা কিছু বললে না, আমিও যে জিজ্ঞাসা করবো সে অবসরও দিলে না। জানি না শিবেনের সংগে মুকুন্দের সম্পর্কটা এখনো সেরকম আছে কিনা। ওরা আমার সংগে এক ক্লাসে পড়েনি বটে, ক্লাস-ফ্রেণ্ডদের চেয়েও ওদের প্রতি ভালবাসা আমার কম ছিল না। ছন্দপতনের মতো শিবেন যেন চলে গেল। বড় হয়েছে সে, ব্যস্ততা তার আছে, কিন্তু পুরানো বন্ধুদের সংগে দু'মিনিট অলস-ভাবে দাঁড়িয়ে আড্ডা না দিক—দুটো কথা কি সে বলতে পারতো না! মানুষ বড় হলে কি ছোট বয়সের বন্ধুরা এমন করে পর হয়ে যায়?

শিবেনকে দেখে মুকুন্দের কথা মনে হলো। মাঝে মাঝে আমার মুকুন্দের কথা মনে হতো, কিন্তু সময় আর সুযোগ করে ওর সংগে দেখা করে উঠতে পারতাম না। সময়ের সংগে সংগে মুকুন্দও কি বদলেছে নাকি—শিবেনের মতো? শিবেনের সংগে দেখা হলো আমার, আমিও মুকুন্দের খবর নিলাম না—ত!

সত্যি, অনেকদিন মুকুন্দের সংগে দেখা নেই। সে-ও আসে না, আমিও আর যাই না, মাঝখানে আমার সর্দি-কাশি হয়েছিল সাংঘাতিক রকম, সে দেখতেও আসেনি। আজকাল কেমন যেন সব ছাড়া ছাড়া। এইজন্যে আমিও আর খোঁজ করিনি। সে এবং শিবেন ইতিমধ্যে বি,এ, পাস করে ল-কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমি প্রায় অচল পদাতিক সৈন্যের মতো কোনো রকমে আই,এ,-র নদী সাঁতরে বি,এ, ক্লাসের ডাঙায় উঠেছি।

মুকুন্দের প্রতি আমার বোধ হয় একটুখানি অভিযোগ জমে থাকবে। এতদিন ওদের বাড়ীতে ছিলাম, এত হৃদ্যতা, তবুও আমার অসুখে একবার দেখতেও এল না। অথচ শিবেনের সংগে একবেলা দেখা না হলে ওর চলে না। সম্পূর্ণ ছেলেমানুষি অভিমান, অর্থহীন এবং অনাবশ্যক। তবু মুকুন্দ কেন আসে না—সেইটেই আমার কাছে তার বড় অপরাধ বলে গণ্য হলো, আমি যে খোঁজ নিই না বা খোঁজ দিই না,—অন্তত একটা পোস্টকার্ড লিখে—সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলাম না। আমার যুক্তির বাহাদুরি কতকটা এই রকমের।

শিবেনের বাড়ীতে যখন মুকুন্দ যেত, ওর মা বাবার দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ গভীরভাবে কী ভাবতো। বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে হয়তো বলতো—আমার বাবার চেয়ে শিবেনের বাবাকে আমার যেন কিরকম নির্বোধ মনে হয়। কিন্তু এ ভদ্রলোক জীবনে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

অর্থাৎ ? আমি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করতাম।

আমার বাবা যে রকম কর্মঠ আর শক্তিমান ছিলেন—তাতে তিনি যে-কোনো দিকেই কৃতকার্য আর সফল হতে পারতেন। আমাকেও তৈরী করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। অথচ শিবেনের বাবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

মুকুন্দ হঠাৎ তার পিতৃদেব সম্পর্কে কেন যে এইসব বিরূপ মন্তব্য করলো—আমি বুঝতে পারলাম না। শিবেনকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম। সে ভেবেচিন্তে জবাব দিলে—বোধ হয় মুকুন্দ পাগল হয়ে যাচ্ছে। আজকাল আমার কাছেও দু-চারটে অসংলগ্ন এলোমেলো কথা এরকম বলে ফেলে। অবশ্য সে-ও ওর বাবার সম্পর্কেই। ওর বাবাই নাকি ওকে ডুবিয়েছে। আমি এ সবের কোনো মানে বুঝতে পারি না।

আমি বললাম—তোমার সংগে এত আলাপ, তুমি বুঝতে পারছো না ?

না—আমার বাবার সংগে মুকুন্দ আজকাল ওর বাবার তুলনা করে। কেন করে আমি কখনো জানতে চেষ্টা করিনি। আমাকে মুকুন্দ ভালবাসে, আমার জন্যে অনেক করেছে ও, এতেই আমি কৃতার্থ।

আজকাল যদি কোনো রকম পারভর্সন ওকে ভর করে—কি করবো বল ? আমি এ বিষয়ে মাথা ঘামাই না। যদি সত্যিই পাগল হয়ে যায়—দেখা যাবে।

জগতে বিচিত্র কিছু নেই। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। মুকুন্দ কি চেহারার সংগে অনুপাত রক্ষা করে বুদ্ধিটাকেও বিকৃত করে তুলেছে ? তাই কি ওর আমার কাছে দীর্ঘ অনুপস্থিতি ? এই মুকুন্দ একদিন নিজের বুদ্ধির সুস্থতার তারিফ করতো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতো—ঈশ্বর তার মন এবং মননকে পংগু করেন নি বলে। কিন্তু আজ কি তার মন দেহকে অনুসরণ করতে বসেছে ? আমি বিশেষভাবে মুকুন্দের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করলাম।

না, মুকুন্দ পাগল হয়নি। ওইরকম সুস্থ, ধীশক্তিসম্পন্ন ছেলে কখনো পাগল হতে পারে না। ইদানীং শুধু ওর বাবার সম্পর্কে ও বিরূপ মন্তব্য করতো। কোনো কারণ নেই, তবু হয়তো মুকুন্দ বলে ফেললে যে ওর বাবার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। আমরা অবশ্য বিকৃত পংগুদর্শন মুকুন্দকে দেখে তা বিশ্বাস করতে পারি নি। মুকুন্দ বলতো—বাবা জীবনে অনেক আশা করেছিলেন, কিন্তু কোনো আশা তাঁর সফল হয়নি। তিনি জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়েছিলেন। জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছেন বলা যায়। তিনি শুধু আশা করতেন, আশাকে সফল প্রয়াসে সার্থকতা দানের যত্ন থাকতো না। আমার মধ্যেও তিনি আশার সঞ্চার ঘটিয়েছেন ; বড়-জীবনের আস্বাদ কেমন—তার ব্যাখ্যা করেছেন আমার কাছে। তুই বড় হোস, তুই মুখ রাখিস, জীবনকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিস নি। আমার মনে তাই কত আশার রোশনাই। অথচ আমি স্পষ্ট জানি সে সব আশা সফল হবার নয়। আমি হাজার চেষ্টা করি না কেন—আমার আকাংক্ষার পূর্ণ রূপ আমি দিতে পারবো না। কেন পারবো না জানিস !—সে শুধু এই বীভৎস চেহারাটার জন্যেই যা আটকে পড়েছি।

আমি চমকে উঠলাম।

এই একবার মাত্র তার মুখে তার বিকৃত দেহের বিপর্যয় সম্পর্কে একটি কথা শুনছি। তা হলে তারও মনে মাঝে মাঝে দেহ-দুর্বিপাকের

ব্যথা জাগে ; সে কাতর হয়ে যায়। বিকৃত দেহ বলেই কি মুকুন্দের মনে প্রতিক্রিয়া জাগে—যার ফলে সে সুস্থ ও সুন্দরদর্শন শিবেনকে আঁকড়ে ধরেছে এমন করে? দেহ-বিকৃতি সম্পর্কে তার সচেতনতার উগ্র প্রতিক্রিয়া নাকি?

শিবেনের মুখেও শুনেছি—একবার নাকি মুকুন্দ তার পংগু দেহটার প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিল, মুকুন্দ বলেছিল—মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালবাসে নিজেকে, নিজের দেহকে। নিজের দেহকে মানুষ যে কত যত্নে কত তোয়াজে কত আরামে গড়ে তোলে তার ইয়ত্তা নেই। পায়ে একটা কাঁটা ফুটতে দেয় না, মাথায় একটা মরা মাস থাকতে দেয় না। দেহচর্যায় মানুষের কত যত্ন, কত সময় আর কত অর্থ ব্যয় হয়—একবার ভেবে দ্যাখ। কিন্তু আমার এই দেহটা? একে কি কারুর কখনো ভালবাসতে ইচ্ছা করে?

কি-একটা প্রসংগে শিবেন অসতর্ক মুহূর্তে মুকুন্দর এই উক্তিটি আমার কাছে বলে ফেলে, নচেৎ আমিও জানতে পারতাম না।

আমি মনে করেছিলাম আগে একবার—যখন দেখা হতো ওদের সংগে,—খেলা সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন করবো, একটা কৌতূহল খেলাকে নিয়ে জড়িয়ে রয়েছে, এখনো সেই আগ্রহটাকে মারতে পারিনি ; কিন্তু এমনভাবে বেখাপ্পা সুরে মুকুন্দ তখন নিজের দেহ-বিকৃতির প্রতি মন্তব্য করে উঠলো, তখন আর খেলার প্রসংগ তোলা যায় না। মুকুন্দেরও মনে বেদনার একটা খনি আবিষ্কার করে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। তবু আমি বলেছিলাম—তুমি মনের দিক থেকে অত্যন্ত ধনী। মনের ঐশ্বর্য দিয়ে দেহের এই লোকসানকে ঢেকে রেখেছো। তুমি ত' কখনো তোমার দেহের জন্যে ব্যাকুল হওনি। তোমার মনের সমৃদ্ধি যে আমাদের গর্বের বস্তু, দেহকে তুমি ত' কখনো বড় বলে ভাবতে শেখো নি।

দেহের এই গলদ আমাকে ব্যথা দিতে পারতো না, যদি আমি বৈজ্ঞানিক হতাম, বা নিজেকে কবি অথবা সাহিত্যিক করে তুলতাম। কিন্তু আমি নিজেকে সেদিকে নিযুক্ত করিনি। আমি যা হতে চাই—তাতে যে দেহের বিকৃতি অনেকটা 'হ্যাণ্ডিক্যাপ'।

মনে হলো মুকুন্দের ভেতরটা হায় হায় করে উঠলো। ওর এমন করুণ অসহায় কণ্ঠ আর কখনো শুনিনি। আমিও ব্যথিত হলাম।

মুকুন্দেরও মনে এই একটা কান্না আছে। মানুষমাত্রেরই এই কান্নার ব্যাকুলতা। শুধু রূপের তফাত, প্রকাশের পার্থক্য! কেউ প্রকাশ্যে হায় হায় করে, কেউ মনে মনে গুমরে মরে। কি? কি তুমি হতে চাও? আমি অধীর আগ্রহের সংগে প্রশ্ন করেছিলাম।

আমি যে কি হতে চাই সেটা তোকে আমি বলতে চাই না, ফল্টু। সে ইচ্ছার কথা আমি কাউকে এপর্যন্ত বলিওনি। হয়তো কাউকে কোনদিন বলবোও না। এমনই সে আকাংক্ষা ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হবে। ফল্টু, এ নিয়ে আমাকে আর বিরক্ত করিস নি! আমার সে ইচ্ছা আমাতেই গোপন থাক্! আমাকে অনুরোধ করে সে কথা জানতে চাসনি।

ঠিক তারপর থেকেই মুকুন্দের সংগে আর আমার দেখা নেই। একবার ভাবছি হুট্ করে একদিন যাই, আবার মনে হচ্ছে—কিরে ফল্টু, আমাকে ভুলে গেলি—বলে হয়ত মুকুন্দই এসে হাজির হবে। প্রকৃতি-নির্ভর কৃষকের বর্ষণ-প্রত্যাশা নিয়ে আমি পথ চেয়ে বসে আছি।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। বোধ হয় বছর চারেক কি তারো বেশী হবে। মনুমেন্টের ধারে এক সভায় শিবেন বক্তৃতা করবে—এই মর্মে কাগজের বিজ্ঞপ্তি দেখে শুনতে গেলাম। কতকগুলি সমস্যার কথা এমন সুন্দরভাবে উপমার পর উপমা সাজিয়ে শিবেন ব্যক্ত করলো—সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। কে এই শোভনদর্শন জনগণ-অধিনায়ক? কে এই নবীন ত্রাতা? আমি কিন্তু শিবেনের ভাষার আড়ালে যেন মুকুন্দকে দেখতে পেলাম। মুকুন্দ শিবেনের কণ্ঠে বসে অনর্গল বকে যাচ্ছে—উপমার পর উপমা যোগান দিচ্ছে—যেমন করে সে কথা বলে, যে ভাষায় সে বকে যায়। এক এক জন মানুষের মধ্যে এমন করে অন্য আরেক জন মানুষকে ধরা যায়! সত্যি বড় আশ্চর্য লাগলো!

শুধু আশ্চর্য কেন—আনন্দও হলো। সেই শিবেন—আমাদের শিবেন, আজ কত বড় হয়েছে! দেশের লোক গলায় মালা দিচ্ছে, ধন্য ধন্য করছে। গর্ব হলো। সংগে সংগে মুকুন্দকে মনে পড়লো,—স্টেজ-ই ত' সব নয়, নেপথ্যটাও সাফল্যের মূলে অনেকটা। শিবেন বক্তৃতা দিচ্ছে আমি মুকুন্দের ভাষা শুনতে পাচ্ছি, শিবেন গলা বাড়িয়ে মালা গ্রহণ করছে, মুকুন্দের গলায় সেই মালা পড়ছে।—মুকুন্দের জন্যেও আনন্দ হলো, গর্ব হলো। এই বিরাট জনসমষ্টির মধ্যে আমিই বোধ হয় একমাত্র প্রিভিলেজে্ড্ ব্যক্তি—যে এই রকম একজন দেশনেতার বাল্যসংগী, তুই-তোকারি করে কথা বলি।

সভার শেষে শিবেনের সংগে দেখা করলাম। আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা—এবার প্রথমদর্শনেই শিবেন আমাকে চিনতে পারলে। এমন কি, নাম ধরে ডেকে 'তুই' সম্বোধন করে বসলে। শিবেনকে দেখবার জন্যে চারপাশে কত-না লোকের ভীড়, কত-না কৌতূহল নারী-পুরুষের! তার মধ্যে আমাকে স্বীকার করে নেওয়ায় আমার বুকটা গর্বে গৌরবে ফুলে উঠলো। একটুতেই আমার এই দশা, আর নিত্য মঞ্চে উঠে হাজার হাজার লোকের হাততালির রথে যে-শিবেন বসবাস করছে—সকল লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার মালা গলায় পরেছে—তার তাহলে মন এবং মেজাজটা কিরকম হবে? শিবেন এখন আর তুচ্ছ নয়, উচ্চ জীবনের অধিকারী।

শিবেন বললে—হাতে তোর এখন কাজ আছে কিছু?

না। ঘরে ফিরবো।

চল্ না, আমার সংগে একটু বেড়িয়ে আসবি চুঁচড়োর—গংগার ধারে—

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—ফিরতে খুব রাত হবে না?—আমি সভয়ে বললাম।

এমন কিছু রাত হবে না। আমার গাড়ী রয়েছে, যাবো আর আসবো। চল্ না, কিছু কথাও আছে তোর সংগে।—শিবেন বললে।

সত্যিকথা বলতে কি, গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে কিছুটা মোটরে ঘুরে বেড়ানো যাবে—এই ভেবেই শিবেনের কথায় রাজী হয়ে গেলাম। এবং মনে মনে ঠিক করে নিলাম, শিবেনের যত কথাই থাক আমার সংগে—আমিও কয়েকটি কথা অবশ্যই জেনে নেব। খেলার সম্পর্কে কৌতূহলটা মেটাতেই হবে, আর মুকুন্দের ব্যাপারটা কী—তাও জানতে হবে। তার ভাষায় কেন শিবেন কথা বলে? তার নির্দেশে কেন সে দৈনন্দিন জীবনের রুটিনকে পর্যন্ত বদলে ফেলেছে? মুকুন্দই বা এখন কোথায়, কি করছে? আমাকে ভুলেই গেল নাকি? আর খেলোয়াড় শিবেন ধীরে ধীরে কি করে দেশনেতা হয়ে দাঁড়ালো? এর পেছনেও কি মুকুন্দের অদৃশ্য সংকেত আছে?

অনেকটা জল ইতিমধ্যে গংগা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। শিবেনের কথায় বুঝলাম।

বয়স বাড়ার সংগে সংগে খেলার জগৎ থেকে সে সরে এসেছে। দু-একটা প্রাদেশিক ক্রীড়াসংস্থা কিম্বা সর্বভারতীয় স্পোর্টস বোর্ডের সেক্রেটারির পোস্ট্ শিবেনের পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু কাগজের দৌলতে ইদানীং দেখতে পাচ্ছি—শিবেন সর্বভারতীয় দেশনেতা হয়ে গেছে; কিন্তু কেন?

শিবেন বললে—কারণটা ঠিক আজ আর মনে নেই, বোধ হয় একটা কোন ঘটনাও এর পেছনে নেই, তুই বরং মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিস, সে ধীরে ধীরে কারণটা বিশ্লেষণ করবে। আমাকে হুকুম করলে, খেলাধুলোর রাজ্যে যে অরাজকতা—তোরা সংঘবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবিধান কর্। বক্তৃতা করার পদ্ধতি বাৎলে দিলে, কী বলতে হবে লিখে দিলে। একটা কথার তিনটে করে উপমা—আজকালকার সাহিত্যের ভাষা। প্রথম প্রথম ওর লেখাই সভায় গিয়ে পড়তাম। পরে মুকুন্দ বক্তৃতা মুখস্থ করিয়ে দিলে। বার বার করে পড়ে পাখির মতো বক্তৃতার ছক মুখস্থ হয়ে গেল। পাড়ায় কোন সভা হচ্ছে, জোর করে পাঠাতো—যা না, এই এই কথাগুলো বল্। এই করে করে কোথায় শিক্ষার বা শিক্ষণের গলদ, কোথায় সখের থিয়েটার দলের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা, অবশেষে

লোহার ওপরে কেন ট্যাক্স বসছে ট্রাম শ্রমিকদের দুর্দশার সুরাহা কোন্ পথে—সব বিষয়েই বলতে শুরু করলাম। কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা থেকে শুরু করে বেংগল-ভলান্‌টিয়ার পর্যন্ত—কোন দলই বাদ গেল না! এইভাবেই আর কি তোদের খেলোয়াড় বন্ধু রাজনীতির মাঠে খেলতে নামলো!—এই দ্যাখ্, বক্তৃতা করে করে আমাকেও কেমন মুকুন্দের ভাষায় পেয়ে বসেছে! নইলে রাজনীতির মাঠে খেলতে নেমেছি বলি? যাক এসব কথা। তোর খবর কি?

বললাম—গতানুগতিক। তোমার অন্যান্য খবর কি?

অন্যান্য খবরের জায়গায় ত' যাচ্ছিস। চুঁচড়োয় সে সব খবর আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—অর্থাৎ?

আমার স্ত্রী আছে সেখানে।

চুঁচড়োয় শিবেনের স্ত্রী থাকে। কে শিবেনের স্ত্রী? এরই মধ্যে শিবেন তাহলে বিয়ে করে ফেলেছে। আমি একটা খবরও পেলাম না। বুঝলাম ধীরে ধীরে কত তফাত হয়ে গেছে আমাদের দুজনের জীবনযাত্রা। কলেজে প্রায় একই খাতে জীবন-প্রবাহের ধারা বইতো। আজ শিবেন ভারতবর্ষের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, আর আমি বিরাট জনগণের একটি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের এক অণুবিশিষ্ট ডট্ বলতে পারা যায়। পার্থক্যের এই চেতনা আমাকে শান্ত করলে। আমাকে সে যে মনে রেখেছে—এই যথেষ্ট; প্রত্যহের জীবনে স্মরণ করবে কেন?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তা ভাগ্যবতীটি কে? নাম জানতে পারি?

রুচিরা। যাচ্ছিস ত'—আলাপ করিয়ে দেব আজ। দেখবি—হাউ চার্মিং।

মুকুন্দ জানে এসব?

ও, ঈয়েস্। মুকুন্দ জানে না আর ফস করে আমি বিয়ে করে ফেলবো? সেটা কি করে সম্ভব? তোরা ঠিক মুকুন্দের সংগে আমার সম্পর্কটা ধরতে পারিসনি।—শিবেন বললে।

ঠিক সম্বন্ধ ধরতে না পারলেও এ ত' জানি যে মুকুন্দ তোমার জন্যে কতটা ভাবে। তোমার কল্যাণকেই সে নিজের কল্যাণ বলে জানে!—আমি বললাম।

হ্যাঁ।। রুচিরার সংগে এই সম্বন্ধ মুকুন্দই এক রকম ঠিক করেছে! চল না—যাচ্ছিস যখন, দেখতে পাবি সব!—শিবেন বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললে।

হু হু করে মোটর ছুটে চলেছে। রাস্তার দুপাশে বাড়ী-ঘর দোকান-পাট ফেলে রেখে গাড়ী এগোচ্ছে। শিবেন চুপ করে গেল, আমিও বাইরের দিকে তাকালাম।

বালির খাল ছাড়িয়েছি। এই খালটা গংগায় গিয়ে পড়েছে—মোহানা দেখা যায় পোলের ওপর থেকে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এখান থেকে একটু এঁকে-বেঁকে চলেছে। লোকালয়ও এত ঘন যে সহরের বাহিরে বেরিয়েছি মনে হয় না। তবু মোটরে যাওয়ার একটা স্বতন্ত্র সুখ আছে। বিশেষ করে আমরা যারা দিনরাত সহরের মধ্যেই নিজেদের বদ্ধ করে রেখেছি—তাদের ভালোই লাগে। পথের দৃশ্য দেখার সম্মোহন একটা যে ছিল না, তা নয়; কিন্তু শিবেন বিয়ে করেছে, খেলাকে নয়,—রুচিরা নামের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছে—এ সংবাদটি আমার কাছে প্রীতিকর ঠেকলো না। খেলা যাই হোক, তাকে নিয়ে শিবেনের ছিনিমিনি খেলার কোনো দরকার ছিল না। মুকুন্দ সব জেনে শুনে কি করে রুচিরার সংগে বিয়েতে মত দিলে? সে ত' সব ঘটনা জানে,—বিশেষ করে খেলা যখন তার কাছে এক রাত্রে গোপনে সব কিছুই ব্যক্ত করে এসেছে, কুমারী জীবনের লজ্জা-সরম কাটিয়ে মুকুন্দের কাছে শরণ চেয়েছে. সেই সময় মুকুন্দ শিবেনকে খেলার কাছ থেকে সরিয়ে এনে রুচিরার সংগে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে! কি রকম যেন গোলমেলে ঠেকছে সব!

আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে শিবেন বলে উঠলো—কি রে,

পথের দৃশ্য দেখে মাথায় তোর কাব্য চাড়া দিয়ে উঠলো নাকি? লেখক মানুষ তোরা—প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটু সৌন্দর্য দেখলেই হলো—বাস।

না, লেখার কথা ভাবছি না।

তবে এমন তন্ময় হয়ে কি ভাবছিস?

ভাবছি, মুকুন্দ তোমাকে এ বিয়েতে মত দিলে কি করে?

কেন?

মুকুন্দ আপত্তি করেনি?—আমি বিমূঢ় বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

দেখলাম শিবেন ততোধিক বিস্মিত। সে যেন খুব আশ্চর্য হয়েছে—এমনভাবে বলে উঠলো—কেন? মুকুন্দের এতে আপত্তির কি থাকতে পারে? মুকুন্দই আমার এ বিয়েতে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছে। তা ছাড়া,—বিয়ে করবো আমি—

ঠিক কথা, তুমিই বিয়ে করবে, কিন্তু খেলাকে বিয়ে না করে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেছো কিনা—

খেলা? খেলা—কে? শিবেন ঈষৎ বিস্ময়ের সংগে এবং নিস্পৃহ সারল্যে জিজ্ঞাসা করলে।

আমি শিবেনের মুখের দিকে তাকালাম। খেলাকে শিবেন ভুলেই গেছে একেবারে?

খেলা কে তুমি জানো না? আমাদের কলেজে—

ও, তাই বল্—ফুলটুসি।—নিতান্ত সহজ সুরে শিবেন কথা কটি বললে।

এখন মনে পড়লো, শেষের দিকে খেলাকে মুকুন্দ ফুলটুসি বলতো,—শিবেনও সেই নামে খেলাকে ডাকতো। শেষের দিকে খেলার এই রকম একটা গোপন নামের খবর আমারও জানা ছিল। কলেজে খেলাকে নিয়ে খুব হৈচৈ পড়ে গেল—তখন খেলাকে ফুলটুসি বলে ডাকা হতো। অবশ্য তারপর থেকে আর খেলার সম্মুখ-বিহার ছিল না, সে আলোচ্য বস্তু হিসাবে নেপথ্যেই রয়ে গেল। তাই খেলার এই নতুন নামটার কথা আমারও স্মরণ ছিল না।

শিবেন স্পষ্ট এবং নিষ্কম্প কণ্ঠে বললে—ফুলটুসিকে এক রকম বিদেয়ই করে দেওয়া হয়েছে।

আমার বিস্ময় আর কৌতূহল ফেটে পড়তে চাইলো, আমি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—কি রকম?

কলেজ-জীবনে ওরকম মেয়েদের সংস্পর্শে আসার অবশ্য দরকার আছে, তা বলে তাদের নিয়ে ত' ঘর-করা যায় না। মুকুন্দ বলে—প্রজাপতিপনা এক জিনিস, আর গৃহস্থ-জীবন-যাপন অন্য কথা। ফুলটুসিকে ও-ই এক রকম তাড়িয়েছে আমার কাছ থেকে। রোমান্টিক সেই অধ্যায়ের যবনিকা পড়েছে অনেকদিন। তুই জানিস না?

আচ্ছা, মুকুন্দের সংগে ফুলটুসির ব্যবহার কিরকম ছিল?—মরি বাঁচি করে আমি শিবেনকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলাম না।

শিবেন একবার আমার দিকে তাকালে, তারপর বললে—মুকুন্দের সংগে খেলার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ভাইবোনের মতো পবিত্র। ফুলটুসির বিপদের দিনে মুকুন্দই তাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছে। মুকুন্দের মতো অমন পবিত্র ছেলে আমি দেখিনি। ওর জন্যেই আমার লেখাপড়া—বা খ্যাতি, যা-কিছু। তবু ওর অন্যায় বা ত্রুটিকে আমি কখনো ছেড়ে কথা বলিনি—অন্তত প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে মুকুন্দ কখনো নিজেকে জড়ায়নি। এদিক থেকে সে সত্যি খুব খাঁটা। আর মুকুন্দের ওই চেহারা দেখে কোন্ মেয়েই বা ঝুঁকবে ওর দিকে।

কলেজে থাকতেই শুনেছিলাম খেলার কুমারী-জাবনের কি সব বিপদ—

ও! তা তোরা বুঝি মুকুন্দকে সন্দেহ করেছিস? দূর গাধা! মুকুন্দ এসবের অনেক উঁচুতে। ওর চেহারাটাই বিকৃত, কিন্তু মন ওর পংগু নয়, আর মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ওর অসাধারণ। ও এত করে তোদের জন্যে, তবু তোরা চিনলি না ওকে! শত্রুদের জন্যেও মুকুন্দ নিশ্চিত কিছু করতে প্রস্তুত, ওর শত্রু নেই বলেই বোধ হয়

সে-ব্যাটারাও মুকুন্দর কাছে মনের দিক থেকে, ধর্মের দিক থেকে, পরোপকার করার দিক থেকে হেরে যাবে। মুকুন্দ ইজ্ ওয়াণ্ডারফুল, ও একটা আশ্চর্যরকমের লোক,—ওকে হীরে বা মানিক বললেও কম বলা হয়।

মুকুন্দ সম্পর্কে শিবেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

একবার যখন কথাটা তুলেছি—তখন খেলা প্রসংগ শেষ করবার ইচ্ছে হলো—শেষে তার কী হলো প্রশ্ন করে। কিন্তু শিবেন সে-সুযোগই দিলে না। খেলার কথাতে সে কোনো-রকম আড়ষ্টতা না রেখে বা একটুও বিচলিত না হয়ে নিজেই সে বলতে লাগলো—ফুলটুসি আসতো আমার কাছে, কি সব প্যানপেনে কথা বলতো, প্রেম, অভিমান, মন-দেওয়া-নেওয়া। বুঝলাম ওর পালক গজিয়েছে! অবশেষে বুঝতে পারলাম যে আমার প্রেমের আগুনেই ও পুড়তে চায়! পালক উঠলে পিঁপড়ের যে দশা হয়—ঠিক তাই হলো খেলার।—খেলা চুরমার হয়ে গেল, মিথ্যা প্রেমের অস্পষ্ট অভিনয়ের ফাঁকটুকু ধরতে পারেনি, তাই সে আমার কাছ থেকে শুধু কলংকের বোঝা বহন করেই ক্ষান্ত হলো! আমাকে তোর খুব বদমায়েস বলে মনে হচ্ছে—না?

আমি বললাম—না, তা নয়। তবে ভেবেছিলাম তুমি হয়তো অবশেষে খেলাকেই বিয়ে করবে, তুমি যখন তার সংগে অমন করে মিশলে। অন্তত মুকুন্দদা তোমাকে সেই আদেশই দেবে—ভেবেছিলাম।

মুকুন্দই আমাকে বাধা দিয়েছে—খেলার কবল থেকে ছোঁ মেরে সরিয়ে এনেছে। বুঝলি?

এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না! কিন্তু তোমারও ত' একটা বিবেক আছে—

খেলার প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করতে আমার সংকোচ হচ্ছিল খুব, কিন্তু শিবেন অনায়াস ভংগীতে সহজে কেমন খেলার কথা নিয়ে আলোচনা করছিল। গাড়ী চলছে—বেশ জোরেই যাচ্ছে, শরীরে একটু দোলা লাগছে, শিবেনের মুখ দেখে মনে হলো—সে বেশ

খুসী হয়েই খেলার কথা আলোচনা করছে, অনুশোচনার কোনো বালাই নেই।

বিবেকের কথা তুলছিস? খেলার পাল্লায় পড়লে বিবেক কারুর থাকে নাকি?

শিবেন একটু চুপ করলে। তারপর বললে—খেলার কথা থাক। তুই যাচ্ছিস আমার স্ত্রীর কাছে—মানে, রুচিরার কাছে, আর অতীতের যত বাজে কথা টেনে আনছিস! অতীত জীবনের ভূত সব তাড়িয়েছি একরকম। তুই আগে রুচিরাকে দ্যাখ্, তখন বুঝবি আমার দোষ ছিল কিনা ফুলটুসির ব্যাপারে। এই রুচিরাকে দেখে একবার ভাবতে চেষ্টা করিস ত' যে এই মেয়েটিকেও আমি বিয়ের অনেক আগে থেকে জানি, কিন্তু এতটুকু ফষ্টিনষ্টি করার সাহস পর্যন্ত হয়নি। কেন হয়নি জানিস? রুচিরা হাতের মুঠো খোলে নি।

হুঁ—বলে আমি চুপ করলাম।

কিন্তু শিবেন থামে না। রুচিরাকে তার কতদূর মনে ধরেছে—তার এক ফিরিস্তি দিয়ে সে রুচিরার পরিচয় ব্যক্ত করতে লাগলো। রুচিরা শান্ত, স্নিগ্ধ এবং কমনীয়। হরিণ-নয়না, সুললিত সৌন্দর্যের অধিকারিণী, কথা তার স্বর্গের আশীর্বাদের মতো মিষ্টি, চাহনি তার প্রাকৃতিক শ্যাম সৌন্দর্যের মতো আনন্দ-বিমোহন। রাজবংশের মেয়ে, অভিজাত রক্ত তার ধমনীতে, কি পরিচ্ছন্ন গৌরবান্বিত ব্যবহার!—ইত্যাদি ইত্যাদি। বিয়ের ব্যাপারেও এরকম বিশেষণ মেলে না অনেকের ভাগ্যে। শিবেনের এই কথাগুলি আমার পর পর মনে থাকবার কথা নয়, আর তার পুনরুল্লেখের এখানে বিশেষ দরকারও নেই।

চুঁচড়োয় গংগার ধারে মস্ত এক বাগান-বাড়ির মতো এক রাজকীয় উদ্যানের এক প্রান্তে বাংলো-ধরণের একটি বাড়ীতে গিয়ে মোটর লাগলো। গংগার ওপরই বাড়ী। এরকম ফুলের বাগান, এত ফাঁকা জায়গা,—এইরকম ধরণের সাজানো-গোছানো ছোট্ট বাড়ী—উপন্যাসে

পড়েছি আর সিনেমাতে জমিদার-বাড়ীর দৃশ্যে দু'একবার দেখেছি। বস্তুতঃ যারা এইরকম বাড়ীতে বাস করে, তাদের সংস্পর্শে কখনো আসিনি। রুচিরাদের যদি এই বাড়ী হয়—তবে রুচিরা যে সত্যিই রাজকুমারী—সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বিস্ময়-বিমুগ্ধ চেতনায় কেমনধারা অভিভূত হয়ে পড়লাম।

গংগার ধারেই একটি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে রুচিরা অর্ধ-নিমীলিত চোখে ঈষৎ কাৎ হয়ে রয়েছে—আর তার একটু দূরে খুব বড় একটি পিয়ানোয় বিলিতি সুর বাজাচ্ছে আর একটি মেয়ে, বোধ হয় রুচিরার পরিচারিকা। বিলিতি গৎ যে এত সুন্দর শোনায়—তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। হয়তো পরিবেশ খুব সুন্দর ঠেকলো বলে—পিয়ানোর বাজনাও মনোরম বোধ হলো। সত্যি—রুচিরার মতো রূপবতী মেয়ে যেখানে থাকে—সেখানে যেন একটা স্বর্গীয় দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। পিয়ানোর আওয়াজ কেন—পরুষ কণ্ঠ পর্যন্ত ললিত শোনায়।

শিবেনের জন্যই রুচিরা প্রতীক্ষা করছিল। এই প্রতীক্ষাকে মুখর করে তোলার জন্যেই বোধ হয় পিয়ানোয় গৎ বাজানোর ব্যবস্থা হয়েছে। রুচিরাই সে-কথা ব্যক্ত করলো, সময় কাটছিল না, প্রতীক্ষা করলে ঘড়ির কাঁটা নড়তে চায় না, তাই সেই প্রতীক্ষাকে সরব করার জন্যেই পিয়ানোর বাজনা।

রুচিরার কণ্ঠ কি মধুর। বীণার স্বরের সংগে নারীকণ্ঠের যে তুলনা করা হয়—তা নিছক সাহিত্য নয়!

শিবেন আমাকে রুচিরার সংগে পরিচিত করিয়ে দিলে। আমি নমস্কার করলাম। রুচিরাও দু'হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানালে। কি পেলব সুকুমার ভংগীতে যে রুচিরা দুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে—আমি শুধু মুগ্ধ হয়ে তাই দেখলাম। এতদিন নাচে অংগ-চালনার মধ্যেই শুধু ছন্দ দেখেছি, কিন্তু ছন্দ যে সামান্য হাত-নাড়ার মধ্যেও পাকাপোক্তভাবে বাস করে থাকে—তা রুচিরার হাত-দুটি তোলার মধ্যে এই বুঝলাম। মোটরে শিবেনের মুখে রুচিরার সৌন্দর্য সম্পর্কে যে সব বিশেষণাদি শুনেছিলাম, এখন মনে হলো সেগুলি

পর্যাপ্ত নয়। আরো অনেক দিক থেকে অনেকভাবে রুচিরাকে বিশেষিত করা যায়। তবুও যেন রুচিরা সেসব বর্ণনার চেয়ে ঢের বেশী নয়নবিমোহন। এমন অনেক শোভনদর্শন স্নিগ্ধ মেয়ে আছে—যাদের বর্ণনা যেমনই দেওয়া যাক না, সবটা ঠিক বলা যায় না, বলার অতিরিক্ত লাবণ্যের অধিকারী হয়ে তারা থাকে। হাতে লীলাকমল না থাকলেও মনে হয় যেন পদ্মের সুকুমার সৌন্দর্যে দু'খানি হাত কোমল, অভিরাম। রুচিরা সেই জাতের মেয়ে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেখলাম —কোথাও খুঁত ধরার মতো সৌন্দর্যের ঘাটতি নেই। টানা চোখের মহিমা শুনেই এসেছি এতাবৎকাল, এখন চাক্ষুষ দেখলাম। আজকাল মেয়েরা চুলে জালিয়াতি করে কালো সুতোর খোঁপা ঝুলিয়ে রাখে, রুচিরার সেরকম মনোবৃত্তি নেই। আকটিতটকুঞ্চিত তার কেশদাম, যেমন কোমল, তেমন মসৃণ। সেই কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশার মতোই কালো, সেই রকম রোমান্টিক। মুখের হাসিটি মিষ্টি, শ্রাবস্তীর কারুকার্য-খচিত শিল্পী-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ নারী-মূর্তির মতোই মুখ। হাসলে লক্ষ্য করলাম—দুটি গণ্ডদেশে গোল, স্নিগ্ধ, নয়নাভিরাম দুটি আবর্তের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবেই হয়, তাতে রুচিরার কোনো চেষ্টা লাগে না। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার সেরা মেয়ে রুচিরা। মনে হলো শিবেনের পিঠ চাপড়ে 'ব্র্যাভো' 'ব্র্যাভো' বলি। কিন্তু শিবেনের সংগে কোনদিনই অতটা হৃদ্যতা আমার হয়নি, তাই মনের বাসনা চেপে রেখে অপলক নেত্রে রুচিরাকে দেখতে লাগলাম। কোন্ সৌন্দর্যলোক থেকে এই সুধাময় অপরূপ মূর্তিকে সংগ্রহ করে এনেছে শিবেন? রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতার কথা মনে হলো। আমার স্মৃতি দুর্বল, তাই কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃত করে রুচিরার সৌন্দর্যবর্ণনার উপযুক্ত উপঢৌকন জোগান দিতে পারলাম না।

রুচিরা বলছিল—প্রতীক্ষার এই সময়টুকু নষ্ট হয় কেন, তাই খানকয়েক বিলিতি করুণ 'কয়ার' বাজাবার জন্যে অনুরোধ করলাম। সময়ের কানে কিছু দিয়ে খোঁচা না দিলে যে তার চলার ঢঙ জানা যায় না।

শুনলাম। এ যেন বিলিতি মেঘদূতের বাণী! নাটক-নভেলে যে রকম সব ঘটে—তাহলে সে সব মিথ্যে নয়।

রুচিরা হাসলো। গালে স্নিগ্ধ ছুটি টোল পড়েছে! একি বাস্তব জগতের রূপবতী কোনো মেয়ে, না রূপকথার রাজ্যে কল্পনাপরীর আঁকা সেই কলাবতী-কংকাবতীর সগোত্র?

রুচিরার সংগে শিবেনের কিছু জরুরী কথা ছিল। সে, আর রুচিরা ঘরের মধ্যে গেল। আমি ততক্ষণে গংগার ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। খেলার চেয়ে রুচিরা হাজারগুণে ভালো কি রূপে, কি আচার-ব্যবহারে। তবে ভালো বলেই যে আগের স্নেহ-ভালবাসা মিথ্যে, প্রীতি প্রেম ফিকে হয়ে যাবে—এ কেমন কথা! শিবেনের আচরণে কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। মুকুন্দও যদি তাকে রুচিরাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে থাকে—তবে মুকুন্দও ঠিক করেনি। মুকুন্দ রুচিরার সৌন্দর্য দেখেই শিবেনের সংগে বিয়ের প্রস্তাব করবে—অতীতের ঘটনার প্রতি কোনো মন দেবে না, এমন মনে হয় না। মুকুন্দের সংগে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না।

হুগলী নদীরও একটা স্তিমিত সৌন্দর্য আছে, বোধ হয় নদীমাত্রেরই একটি স্মিত রূপ আছে—যা মানুষকে আকৃষ্ট করে থাকে। হুগলী নদীর ছু'পাশেই সহুরে সভ্যতার অভিশাপ দেখে এসেছি। বন্দর, লোহালক্কড় মাল তোলার ক্রেন, শান-বাঁধানো ঘাট, স্টীমারে ওঠার ভাসমান প্ল্যাটফরম। তীর নেই, তীরের গাছপালা নেই, শুধু ঘোলা জলের স্রোতের উদ্দামতা আছে। চুঁচড়োর গংগাতীরে কিন্তু সবুজের একটু সমারোহ চোখে ঠেকলো। অন্ধকারে নদী যেন নীরব সাধিকার মতো নিজের ধ্যানেই একান্ত মগ্ন। দুই তীরে অন্ধকারের কালি ঢালা, রহস্যলোকের মত নীরব। ওপরে তারাভরা আকাশ। ভারাক্রান্ত মনে প্রকৃতির দিকে ভাবুকের দৃষ্টি নিয়ে তাকালে এখনো মনটা বিহ্বল হয়। প্রকৃতি আজো মানুষের মনকে আতুর করে তুলতে পারে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবেন ফিরে এল; জানালে—খেয়ে যেতে হবে এখান থেকে—রুচিরার হুকুম। আমি আর 'না' করলাম না।

কোনো কোনো মেয়ের হুকুমই হোক আর অনুরোধই হোক—অমান্য করা যায় না। রুচিরা সেই জাতের মেয়ে। আমি শিবেনের নগণ্য বন্ধু, তবু যে আমাকে এমন করে গ্রহণ করা, নিমন্ত্রণ করা—যতই সামান্য হোক, এতে রুচিরার শিষ্ট সৌজন্যের পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলে।

তিনজনের একসংগেই খাওয়া হলো এক টেবিলে। খেতে বসে মুকুন্দের কথা হলো, কলেজ-জীবনের কথা হলে রুচিরা শোনে আর স্নিগ্ধ হাসির স্তিমিত আভায় পরিবেশটি মনোরম করে তোলে।

এর পর ফেরার পালা। আমার হাতে কিছু ভাজা মশলা আর এলাচ দিয়ে রুচিরা নমস্কার করলে; বললে—আবার আসবেন। এরকমভাবে বিনা নোটিশে এলেন, কোনো আপ্যায়ন করতে পারলাম না, এমন কি প্রথম দিন এসে ঠাকুরের হাতের রান্না খেয়ে গেলেন—এ অপবাদটা দূর করার একটা সুযোগ চাইছি,—আশা করি, সে সুযোগ আমি পাবো। অন্তত পাওয়া আমার উচিত। কি বলেন?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—বলতে বলতে আমি বের হয়ে এলাম শিবেনের সংগে। মেয়েদের সামনে বেশী কথা বলতে আমি কোনোদিনই পারিনি, সেদিনও কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। রুচিরা সুন্দরী—কিন্তু সাদাসিধে, কোথাও গর্বের মূঢ়তা তাকে আচ্ছন্ন করেনি, অন্তত আলাপ-আলোচনায় সে আড়ষ্ট নয়। সহজ আবেগে সাধারণ ভংগীতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

ফিরতি পথে শিবেনের সংগে বেশী কথা হয়নি। সে শুধু জিজ্ঞাসা করলে—কেমন দেখলি?

অপূর্ব!

মুকুন্দ কিন্তু এ ধরণের জবাব দেয়নি। এখানেই তোর আর মুকুন্দের তফাৎ—শিবেন বললে।

মুকুন্দ রুচিরাকে প্রথম দেখে কি বলেছিল—তা জানবার ইচ্ছা আমারও হলো।

শিবেন বললে—মুকুন্দকেও ঠিক আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম। সে বলেছিল—চিনি কি রকম মিষ্টি, কিম্বা ভেজালহীন মধু কেমন

খেতে—তুই বুঝিয়ে দে ত'। তারপর রুচিরাকে কেমন দেখলাম—বলবো। মুকুন্দের কথাটা ভেবে ছাখ্, চিনি কেমন মিষ্টি—তা বলা যায় না।

আমি বললাম—মুকুন্দের সংগে কার তুলনা বল ? আমাদের মধ্যে কেন, দেশের মধ্যে, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে, ওরকম ব্রেনী চ্যাপ্ ক'টা আছে ? ও ত' জিনিয়াস। মেধার দিক থেকে পংগু বলেই বোধ হয় একটা প্রশ্ন আমাকে খোঁচা দিচ্ছিল, রুচিরা সম্পর্কে অবশ্য সে প্রশ্নটি। রুচিরা শিবেনের স্ত্রী, কিন্তু হিন্দু রমণীর মতো কোথায়ও ত' তার মাথায় বা কপালে সিঁদুরের রেখা দেখলাম না। হাতে নোয়া-শাঁখা নেই। রুচিরা কি বাঙালী মেয়ে নয় ? না কি আজকালকার য়্যারিস্টোক্র্যাসি। সাহেবিয়ানাকে আমরা যে কতদূর নকল করেছি—তারই উদাহরণ ?

আদব-কায়দায়, চলনে-বলনে মহিমময় একটা উন্নত শুচিশীলনের স্বাভাবিকতা রুচিরার সংগে জড়িয়ে আছে। উচ্চ ধনীসম্প্রদায়ের সংগে পরিচিত নই, কি করে জানবো—সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মতো ধনী বিদুষী মেয়েরা কপালে সিঁদুরের টিপ আঁকে কিনা।

কিন্তু মুকুন্দের বিষয়ে কথা উঠতে আর সে-প্রশ্নটি উত্থাপন করতে পারলাম না। ফেরার সময় রাস্তা ফাকা। হু-হু করে বাতাস বইছে, পরিষ্কার জনবিরল পিচের পথ, দ্রুতগতি মোটর। তার ওপর মুকুন্দের সম্পর্কে এ-কথা সে-কথা। সে এম.এ. আর এল.এল.বি.-তে ফার্স্ট হয়েছে, য়্যাডভোকেট হয়েছে কিন্তু প্র্যাক্‌টিস করে না। হাইকোর্টে ডেপুটি লিগ্যাল্ রিম্যামব্র্যান্সারের পোস্টে ইণ্টারভিয়ুতে খুব ভালো করেও সে চাকরী নেয়নি। আইনগত বুদ্ধিতে সে অনন্যসাধারণ। কয়েকটি ফার্মে এই খবর পৌঁছে যাওয়ায় এখন সে দু-একটি প্রতিষ্ঠানের লিগ্যাল য়্যাড্‌ভাইসর। তবে শীগ্‌গিরই সুপ্রিম-কোর্টে যাচ্ছে, সেখানে আইন সংক্রান্ত ব্যাপারেই হয়তো কোনো প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতার কাজ পেতে পারে। অর্থের অবশ্য তার দরকার নেই। তবু নিজের সময় যাতে অনলসভাবে কাটে—সেজন্যে তার চাকরি চাই। কাজের মধ্যে নিজেকে ছিটকে দেওয়ার নেশা মুকুন্দের বরাবরের—সে কথা ত'

জানিস! চাকরি করে যে-অর্থ সে উপার্জন করবে—তা সে দেশের কাজেই ব্যয় করবে। দান করবে নানা প্রতিষ্ঠানে, কিম্বা দুঃস্থ দুর্যোগগ্রস্ত শিল্পীকে, সাহিত্যিককে। এই রকম সাধু সংকল্প করেই সে চাকরী নিয়েছে।

আজো সে রাউত-নগরীতেই আছে। তবে শীগ্‌গিরই যাবে দিল্লীতে। মনে মনে তখনই সিদ্ধান্ত করে ফেললাম—একদা তার ওখানে যাবো, তাকে ভুলে থাকা বা তার ওপর অভিমান করা আমার পক্ষে শোভন হয়নি।

যাই যাই করে আর রাউত-নগরীতে গিয়ে মুকুন্দের সংগে দেখা করা হলো না। দুটি বছর রোগে ভুগেই একরকম কেটে গেল। অল্প জ্বর, বেশী কাশি, দুর্বলতা—এই নিয়েই আমার সময় কাটতে লাগলো। কখনো স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, কখনো ফাজ্‌, কখনো এ.পি.। কালরোগে ধরেছে! গরীব পিতার যত্নশীল এবং সাধ্যাতীত চিকিৎসার উপসংহার হিসেবে তাই আজ চেঞ্জে ওয়ালটেয়ারে বংগোপসাগরের কূলে এসে বসেছি—মামিডি-পল্লীতে। এখান থেকে মুকুন্দকে আজ স্পষ্ট মনে পড়েছে। কতদিন দেখা হয়নি, এখানে আসার আগে কোলকাতায়ও বহুকাল দেখা করতে পারিনি বলে সে একদা এসেছিল। আজ মুকুন্দের মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। কুঁজো, অসমানস্কন্ধ, তীক্ষ্ণধী, বিকৃতদেহ সেই মুকুন্দকে খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে। সেই পরোপকারী স্নেহশীল মমতাপ্রবণ মুকুন্দ। সে তৈরী করেছিল শিবেনকে। শিবেনের জীবন তারই হাতে গড়া। খেলোয়াড় শিবেনকে নয়, কিন্তু খেলাধুলোর সংগঠক শিবেনকে, রাজনীতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের নেতা শিবেনকে। চলনে বলনে, আলাপে আলোচনায় শিবেনের সাফল্যের পথ সে তৈরী করে দিয়েছে। শিবেনের সব কাজের আড়ালে মুকুন্দ বলিষ্ঠ শক্তির মতো উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খেলোয়াড় শিবেন ছাড়া অন্য যে

কোনো পরিচয়ের শিবেনের পিছনে যে মূর্তি—তাকে আজ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে।

কাগজে বেরিয়েছে সে হত্যা করেছে শিবেনকে। কিন্তু কেন? গোড়া থেকে যতই ভাবা যাক—এই কেন-র উত্তর মিলছে না। শাস্ত্রে আছে যে বিষবৃক্ষও যদি মানুষ নিজের হাতে রোপণ করে—বিষবৃক্ষ জেনেও সে তাকে নিজে কেটে ফেলতে পারে না। আর নিজের হাতে গড়া একটি মানুষকে হত্যা করবে মুকুন্দ? না, না—তেমন ছেলে সে নয়। স্নেহে মমতায় দরদে তার মন ভরপুর। আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, আমার চেনা-জানা লোকের মধ্যে ওর মতো এমন মমতায় অনুরাগে কোমল মানুষ আমি আর দেখিনি। তাই মনে হয় সংবাদটির মধ্যে কোথাও হয়তো কারচুপি আছে। গোটা সপ্তাহ-ভর আমার মনে শুধু এই চিন্তাই প্রকট হয়ে রইলো। মুকুন্দ কেন শিবেনকে হত্যা করতে গেল? সত্যই কি সে শিবেনকে হত্যা করেছে?

বলতে ভুলেছি—আমার অসুখের সময় বাবার পত্র পেয়ে মুকুন্দ একবার দেখা করতে এসেছিল দিল্লী যাবার আগে। সে এসে আমাকে প্রচুর তিরস্কার করলে তার বাড়ি ছাড়ার জন্যে। তারপর আমার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য—সব-কিছুর ব্যবস্থা করে দিলে। বাবাকে নিশ্চিন্ত করে বললে—আপনি অকারণ ভাবছেন জ্যাঠামশায়, এসব রোগ আজকাল নির্মূল হয়েই সারে। তা ছাড়া, ফল্টু আমার আত্মীয়ের মতো। আজকাল আমি রোজগারপাতি করছি। আপনার আশীর্বাদে ফল্টুর চিকিৎসার খরচ আমার পক্ষে কোনো বোঝা হবে না।

তারপর বাবার অসাক্ষাতে আমার সংগে মুকুন্দের আরো কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। আমি রুচিরার কথা জিজ্ঞাসা করলাম—যদি কিছু মনে না করো ত' একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—অবশ্য আমার অধিকারের বাইরে সে-প্রশ্ন। তবু নিছক কৌতূহলবশতঃ জানতে চাইছি আর কি। রুচিরা মেয়েটি কে?

মুকুন্দ আমার মুখের দিকে তাকালে, এই রকম প্রশ্নের জন্যে সে তৈরী ছিল না; তবু আমার দিকে চেয়ে সে বললে—তুই একদিন

প্যারাডাইসে গিছলি শুনলাম। নিক্ষের সংগেও আলাপ হয়েছে। শিবেন আমায় সব বলেছে। সুতরাং রুচিরা সম্পর্কে তোর আগ্রহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

প্যারাডাইস মানে চু চড়োর বাগানবাড়ি আর রুচিরার ডাকনাম ওরা দিয়েছে নিক্ষ্। মুকুন্দের কথা থেকে তা বোঝা গেল ক্রমে ক্রমে।

বেশ সহজভাবেই আমি বললাম—আমি ত' রুচিরাকে দেখে একটু অবাক হয়েছি। সে বাঙালী কিনা বুঝতে পারিনি। অবশ্য পরিষ্কার বাংলা কথা বলে, বাঙালীর মতো হাবভাব, কিন্তু মাথায় সিঁদুর নেই, হাতে নোয়া নেই।

মুকুন্দ একটু নির্লিপ্ত হয়ে বললে—তখনো পর্যন্ত যে শিবেনের বিয়ে হয়নি রুচিরার সংগে। এইত' কিছুদিন হলো অফিসিয়াল ম্যারেজ হলো। রুচিরার মা-বাবার মত পেতে দেরী হয়নি একটুও—শিবেনই বিয়েটা ঝুলিয়ে রেখেছিল।

একটু থেমে মুকুন্দ আবার বলতে লাগলো—আমি এই বিয়ে ঠিক করে দিই। দিল্লীতে আসার পর রুচিরাদের পরিবারের সংগে আমার একটু দহরম-মহরম হয়। রুচিরার বাবা দিল্লীর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, ভারত-সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি রুচিরার বিয়ের জন্যে একটি কৃতী ছেলের সন্ধানে ছিলেন। প্রথমে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু সংবাদপত্রের কল্যাণে শিবেন ভারতবর্ষীয় নাগরিক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, এক ডাকে তাকে সকলেই চেনে। তা ছাড়া, শিবেন অত্যন্ত সুপুরুষ, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান্—তার ওপর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আমিও ভাবলাম যে শিবেনকে যখন সরকারী চাকরি নিয়ে অল্ ইণ্ডিয়া স্পোর্টস্-বোর্ডের কর্তা হয়ে দিল্লীতেই আসতে হবে শেষে, তখন দিল্লীর এই বাঙালী পরিবারে ওর আত্মীয়তা হোক। আমি রুচিরার বাবাকে বললাম—উনি খুশী হলেন, শিবেনের চেহারা হামেসাই কাগজে ছাপা হতো, সুতরাং পাত্র অপছন্দ হলো না। চাকরিটাও ভালো—শিবেন নিখিল ভারত স্পোর্টসের হর্তাকর্তা। বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেল—পাকা-দেখার দিন পর্যন্ত, কিন্তু রুচিরা বেঁকে

বসলো। বিলেত থেকে বেড়িয়ে ফেরা মেয়ে, পশ্চিমী কায়দাদুরস্ত, তার ওপর জৌলুসের ডিপো। সে বললে—তোমরা যাকে-তাকে ধরে এনে দিলেই কি আমি বিয়ে করবো? আমাকে দেখতে হবে, বিচার করতে হবে, ভাবতে হবে। মানিয়ে তাঁর সংগে আমি বা আমার সংগে তিনি ঘর করতে পারবেন কিনা—জানতে হবে। তাই বলছি বিয়ের আগে ভদ্রলোকের সংগে আমি একটু আলাপ করতে চাই। ঠিকুজী-কোষ্ঠীর মিলের চেয়ে বড় মিল হলো এক মনের সংগে আরেক মনের। কিছুদিন আমাদের একত্র আলাপ করতে হবে। পরস্পরকে আমরা জানি প্রথমে, চিনে নিই একে অন্যকে—তারপর বিয়ে। বুঝলি ফল্টু, সোজা কথায় যাকে বলে—প্রেম করে বিয়ে করবে। রুচিরার বাবা মেয়েকে অনেক বোঝালেন—সে নাছোড়বান্দা! তোমরা গাঁটছড়ার সংগে এমন একটা পুরুষ মানুষ নামক আদমিকে গলায় ঝুলিয়ে দাও যে, বাঙালী মেয়েদের জীবনটা বিষিয়ে ওঠে। তার চেয়ে যাচাই বাছাই করে পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করুক—এতে অনেকটা ভালো হবে। মানুষের মন আর যাই হোক—জড় পদার্থ নয়।

আরো অনেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু রুচিরার ওই এক বায়না। আগে প্রেম না করে বিয়ে সে কিছুতেই করবে না। তাই চুঁচড়োয় ওই অভিনয়—বাগানবাড়ি, নির্জনতা, গান, প্রাণ ইত্যাদি। প্রেমের মহড়া বলতে পারিস। রুচিরা সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্ন, আর উচ্চশিক্ষিত। ইংরাজী সমাজের সব-কিছুই ওর কাছে ভালো, আর হিন্দুদের যা-কিছু, তার ষোলো আনা না হলেও বারো আনা মতন জিনিস ট্র্যাশ। প্রাচীনতার মোহে সেগুলো আঁকড়ে থাকলে জীবন গতিহীন অসাড় হয়ে পড়বে।

আমি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি রুচিরা সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে ফেলতে পারবো না। আমি তার ভাবী স্বামীর বিগত জীবনের একজন স্তাবক বন্ধু মাত্র, সেই আমার প্রতি রুচিরার কি স্নিগ্ধ ব্যবহার। এরই মধ্যে তা ভুলতে পারি না। আমাকে আবার যাবার—এবং অবশ্যই যাবার নিমন্ত্রণ করেছে। ইংরাজিয়ানায় ত' এ জিনিস নেই। ইংরেজদের

ভালোকে রুচিরা নিয়েছে—আমাদের ভালোকেও সে নিতে কুণ্ঠা করে না।

আমাকে রুচিরা যাবার নিমন্ত্রণ করেছিল, যেতে পারিনি। সে হয়তো কিছু ভাবতে পারে, আমার দেমাক হয়েছে বা অন্য কিছু, কিন্তু আমি অসহায়। তাছাড়া খাবার নিমন্ত্রণটা একেবারেই সৌজন্য রক্ষার্থে, বলতে হয়—রুচিরা বলেছে। আর আমার কথা হলো যে রোগমুক্ত না হলে কোথায় যাবো? এতে যদি কেউ আমাকে অসামাজিক বলে—তবে তা ঠিক হবে না। রুচিরা সম্পর্কে ঠিক ওই কথা খাটে, বিলেত ঘুরে এসে একটু স্পষ্টতা এসেছে—আড়ষ্টতার মৃত্যু ঘটেছে। মুকুন্দ যতই রুচিরা সম্পর্কে বিরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করুক, রুচিরা বেশ মেয়ে। রুচিরা যেমন স্নিগ্ধ, তেমনই পরিচ্ছন্ন।

মুকুন্দের সংগে সেই আমার শেষ দেখা। আমি তখন চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে খেলার কথা জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিলাম। কি হলো খেলার? তার দুর্যোগের মেঘ কেটে গেছে ত'? কি করছে সে এখন? কোথায় আছে?

খেলার কথা এমন আচমকা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যে মুকুন্দ একবার আমার মুখের দিকে তাকালে। পরে একটু হাল্কা সুরে সে বললে—ভয়ে ভাবনায় খেলা আর শিবেন প্রথমটা দিশেহারা হয়ে নানারকম টোটকা-টুটকি করে। চটকদার বিজ্ঞাপনের মোহে আকৃষ্ট হয়ে এমন কাণ্ড করে বসেছিল,—যাতে খেলার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে পড়ে। তারপর অবশ্য বাংলার বাইরে যেতে হয়, এক হাঁসপাতালে মৃত শিশু প্রসবের পর সে যাত্রা রক্ষা পেল খেলা; বেশ কিছু টাকা খরচ হয়—আমিই সে-যাত্রা খেলাকে আর শিবেনকে বাঁচাই। বিপদের দিনে ওদের না দেখলে উভয়েরই বড় মুশকিল হতো। শিবেনটা বরাবর ওই রকমের। খেলা এখন শিবেনের হাত থেকে বেঁচেছে, খেলা ভালোই আছে। সম্প্রতি বি. এ. পাস করেছে প্রাইভেটে। কোথায় যেন কোন্ অফিসে কী কাজও করছে। মোটামুটি চালাচ্ছে আর কি। একটা দুঃস্বপ্নের পর জেগে উঠেছে সুস্থ হয়ে।

নীতির প্রতি, শুচিশীলনের প্রতি মুকুন্দের এমনধারা মনোভাব ত' ছিল না। জীবনকে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে সে এখন দেখছে? খেলা আর শিবেনের এই ঘটনাকে মুকুন্দ এমন সহজ করে নিতে পেরেছে? এমন ভাবে খুশির সংগে সে এই সমাধানকে বর্ণনা করতে পারলো?

শিবেনের প্রতি বীতরাগের কোনো লক্ষণও দেখিনি মুকুন্দের হাবভাবে। শিবেনকে বাঁচিয়ে রেখে এমন ভাবে চালাতে পারছে জেনেই মুকুন্দ খুশী। সেই মুকুন্দ শিবেনকে কি করে খুন করলে? ব্যাপারটা জানতে বড় ইচ্ছে হয়।

বাবাকে একটা চিঠি লিখব কিনা ভাবতে লাগলাম, ল্যান্সডাউন রোডের ঘটনা সম্পর্কে। বাবাও দক্ষিণ কোলকাতায় থাকেন। আর মুকুন্দ যখন আসামী, তখন বাবা কি আর তার খোঁজ রাখেননি? আবার ভাবলাম এখন জোর পুলিসী তদন্ত চলছে—এই সময় মুকুন্দ আর শিবেন সম্পর্কে কৌতূহল জানানো মানেই নিজেকে ওই জালে জড়িয়ে ফেলা। তাই শুধু নিজের মনের তোলপাড়কে উপলব্ধি করা ছাড়া কৌতূহল নিরসনের অন্য কোন পথ দেখতে পেলাম না। খেলাকে কেন্দ্র করে শিবেন এবং মুকুন্দের মধ্যে কোনো ঈর্ষা দানা বাঁধেনি। খেলা সম্পর্কে মুকুন্দের মন পরিষ্কার ছিল, উপকারী উদার বন্ধু হিসাবে খেলাকে সে যাহোক করে পাঁক থেকে তুলে আবার একটি খেই ধরিয়ে দিয়েছে চলার পথে। এটুকু এখন বুঝেছি। খেলা আবার জীবনযাত্রার ছিন্নসূত্র গেঁথে চলবার চেষ্টা করছে—জীবনের অন্য অধ্যায়ে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলছে। পিছনের অতীত হয়তো সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে না পারলেও খেলার পক্ষে বর্তমানকে স্বীকার করাই বুদ্ধির কাজ হয়েছে।

মুকুন্দের চরিত্রে নারীর প্রতি আসক্তি কোথাও প্রকট হয়ে দেখা দেয় নি। আসলে নিজের বিকৃত দেহের বাস্তব প্রকাশকে কোথাও ঢাকা দেবার চেষ্টা করেনি বলেই কোনো নারীর প্রতি কখনো নিজেকে শ্লথ করেনি। সুতরাং সুপুরুষ শিবেনের ওপর কুশ্রী মুকুন্দের কোনো ঈর্ষা জাগতেই পারে না।

কিন্তু কাগজের সংবাদকে কি করেই বা মিথ্যে বলি? মুকুন্দ শিবেনের হত্যাকারী বলে সংবাদ রটেছে। এই সংবাদটির পিছনে নিশ্চয়ই কিছু অলিখিত কথা আছে। এর এমন একটা পটভূমি আছে—যাতে মুকুন্দের পক্ষে সম্ভব হয়েছে শিবেনকে মারা। কী সেই কথা? কী সেই পটভূমি?

মনটা আকুল হয়ে উঠলো। এত দূরে থেকেও তবু বাংলা দেশের স্মৃতিধূসর জীবনের জন্যে কাতর বোধ করলাম। কিন্তু কত দূরে আছি। সমুদ্র তীরে অন্ধ্র দেশে, মনটা তবু বাংলার মাটি ছুঁতে চায়!

উত্তাল-তরংগ-সংক্ষুব্ধ বংগোপসাগর। কী মহনীয় নয়নাভিরাম তার রূপ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন অপলক দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও এই একই সমুদ্র কখনো পুরনো হয় না। এক রকমের ঢেউয়ের লীলা, একই অভিরাম তরংগ-ভংগ, একই জলোচ্ছ্বাসের ধ্বনি। তট ও সৈকতের একই রূপ—তবু কত বিচিত্র, কত অভিনব। প্রতি মুহূর্তে একই জিনিসের নতুন ব্যঞ্জনা! মানুষও কি তেমনই? একই মন, একই মনন—তবু কত বিভিন্ন? একই মুকুন্দের নতুন কোনো বিবর্তন কি—শিবেন বুঝি বিবর্তনের শিকার? সমুদ্র-প্রকৃতির চিরন্তনতা রয়েছে, তথাপি বৈচিত্রের মধ্যে একটা শাশ্বত ভংগী আছে; কিন্তু মনুষ্য-প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার মধ্যে কোন স্থিরত্ব যে কল্পনা করা যায় না! মুকুন্দের মনের ভাব বুঝবো কি করে?

শিবেন-হত্যার খবর পাওয়ার পর সাত কি আট দিন কেটেছে—এমন সময় মস্ত বড় একটা চিঠি এসে হাজির হলো। রেজিস্ট্রি-ডাকে মোটা একটা প্যাকেট এসেছে। আমি সে-সময় ওখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠাগারে গিয়েছিলাম, এমন সময় পিওন খোঁজাখুজি করে আমাকে বার করে। রুগ্ন এক বাঙালী সুদূর এক প্রদেশের এই অঞ্চলে পড়ে আছি নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করার জন্যে—সকলেরই প্রায় করুণাপাত্র হয়েছিলাম। সুতরাং আমার নামটা সকলে জানতো, এমনকি আমার গতিবিধি পর্যন্ত অনেকের অজানা ছিল না। তাই চিঠিটা ফেরত যায়নি।

সই করে মোটা লম্বা লেফাফাখানা নিলাম। একগাদা কাগজ ভরা। প্রথমটা বুকের মধ্যে ভয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। রেজিস্ট্রি করে এভাবে অফিসিয়াল ধাঁচে লম্বা লেফাফায় কী এল? এখানকার ঠিকানা দিয়ে বাংলাদেশের কোনো কাগজে প্রকাশের জন্যে কোনো উপন্যাস ত' পাঠাইনি, যা ফেরত আসতে পারে। অন্য কেউ তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়ানোর জন্যে পাঠাল নাকি? তাই বা কি করে সম্ভব? আমি এখনো এমন কিছু দরের লেখক হইনি যে আমার কাছে নতুন লেখক লেখা পাঠিয়ে মত নেবে।

বাবার কিছু হয়নি ত'? তাঁর অফিস থেকে কিছু হয়তো পাঠিয়েছে। বেপথুকাতর অস্থির দুটো হাতে খামের কোণটা ছিঁড়লাম। এক তাড়া কাগজ তার ভেতরে পাট করে মোড়া রয়েছে। মেটে রঙের কালিতে কি যেন লেখা। চোখ মেলে ভালো করে তাকাতেই দেখলাম—মুকুন্দের হাতের লেখা। মুকুন্দের চিঠি। সে আমার কাছে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছে।

নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে তখনই সে-চিঠিখানা পড়তে শুরু করলাম। খোলা দরজা দিয়ে আর্দ্র সমুদ্র-বাতাস আসছিল—তবু যেন আমার কপালে ঘাম চিক চিক করে উঠলো। আবেগে উত্তেজনায় আমার শরীরে কাঁপুনি ধরেছিল।

মুকুন্দ লিখেছে—

প্রিয় ফল্টু, আশা করি আমাকে তোর এখনো মনে আছে। অন্তত এত তাড়াতাড়ি তুই আমাকে ভুলে যাবি না। সে বিশ্বাস আছে বলেই তোর কাছে আমি এই চিঠি লিখতে বসেছি। যখন তুই এই চিঠি পাবি, তখন আমি আর এই পৃথিবীতে থাকবো নারে—অন্তত মরজগতে-বিকৃত মানুষের চেহারায় সুস্থবুদ্ধির অভিনয় করার জন্যে বেঁচে থাকবো না। আমি নিজেই নিজের দেহাবসান ঘটাচ্ছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি এই জগৎ ও জীবনকে বিসর্জন করছি। বলতে পারিস খোলস বদলাচ্ছি—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।

কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর ওপর মানুষের হাত নেই। জন্ম হয় সম্পূর্ণ আকস্মিক, মৃত্যুও আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা রাখে না। জানিস, আমি এই মৃত্যুর সাধারণ ধর্মকে আমার ক্ষেত্রে মিথ্যে প্রমাণ করে দেখাবো যে আমার মৃত্যু অন্তত আমার ইচ্ছাধীন। মহাভারতের ভীষ্মের মৃত্যুর স্বরূপ ঠিক জানি না, কিন্তু আমি সুইসাইড্ করবো। করে প্রমাণ করবো যে মৃত্যুও মানুষের ইচ্ছার দ্বারা চালিত।

কেন? এ প্রশ্ন তুই করতে পারিস। এই প্রশ্নের জবাবই হচ্ছে আমার এই দীর্ঘ চিঠি। আবেগে অধীর হলে, বেদনায় চুরমার হলে মানুষ একজনের কাছ থেকে অন্তত একটু সান্ত্বনা বা সহানুভূতি ভিক্ষা করে। আমি অবশ্য তা করছি না, কারণ তার আর দরকার নেই। তবে মরার আগে আমার হৃদয়াবেগের একটুখানি আকুলতার খবর তোকে জানিয়ে যাই। তুই অন্তত ঘটনাটির যথার্থতা জানিস। সত্য কী ঘটেছে—অন্তত তুই জেনে যা। এইটুকুই আমার লাভ যে আমি একজনের কাছে আমার মর্মের কথাটুকু পৌঁছে দিতে পেরেছি।

খেলাকে তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি যাকে ফুলটুসি বলতাম,—তোরা খেলা খেলা করে মেতে উঠেছিলি, বিশেষ করে—তুই, মনে মনে খেলার জন্যে একটা আকুলতা জিইয়ে রেখেছিলি। খেলার চলন-বলন এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে তাই তোর অত আগ্রহ ছিল। আর সেই আগ্রহের জন্যে তুই নিজেকেও বড্ড ব্যস্ত করে তুলেছিলি। আজ বোধ হয় সেই উগ্র ব্যস্ততাকে তোর হাস্যকর ঠেকতে পারে, কিন্তু ঘটনাটা ত' সত্য ছিল।

এই খেলা সম্পর্কে তোকে একটা মলিন সন্দেহ স্পর্শ করেছিল, তুই হয়তো ভাবতিস খেলার অসহায় অবস্থার সুযোগে আমি মানুষের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাণীর পর্যায়ে নিজেকে নামিয়ে দিয়েছি। কিন্তু না রে—মানুষকে মর্যাদা দেবার শিক্ষালাভ করার ভূত তখনো আমার ঘাড়ে চেপেছিল। আমি কখনো এভাবে নিজেকে দুর্বল করিনি, ছোট করিনি, অপমানিত করিনি।

আমার চেহারাটা বদখৎ—এ-কথা আমার চেয়ে ভালো করে বোধ হয় আর কেউ জানতো না। এর জন্মে কাকে দোষী করবো? নিজের অদৃষ্ট নিয়ে—আমার খুব গর্ব ছিল না—তাই ভাগ্যকে পর্যন্ত দোষ দিইনি। কাউকে আমি দুষিনি। আমার বাবা মস্ত এক হাম্বাগ্ ছিলেন—সব-তাতে তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে যেতেন, ফলে কোথাও পাত্তা পাননি। তার ওপর রাজনীতিতে তাঁর অগাধ দখল ভেবে তিনি ভারতের রাজনীতিতে নিজেকে জড়িয়েছিলেন এবং এই রাজনীতি করতে করতে নিজের জমিদারী প্রায় বিকিয়ে বিলিয়ে দিতে বসেছিলেন—নিজের দিলদরিয়া মেজাজের খেসারত দিতে দিতে। এ খবর তুই জানিস কিনা জানি না। তবে তাঁর বিখ্যাত হবার দুর্বার সখ ছিল, যে কোনো একটি বিষয়ে নিষ্ঠা নিয়ে যদি তিনি চলতেন, একটি বিষয়ের চর্চা বা সাধনা করতেন—নিশ্চয়ই তিনি বিখ্যাত হতে পারতেন। তেমন মনীষা, বুদ্ধি এবং প্রতিভা তাঁর ছিল; কিন্তু তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে গেছলেন। ভারতবর্ষে এমন কোনো ব্যাপার বা বিষয় নেই—যাতে না তিনি অকারণ উৎসাহ ব্যয় করেছেন—ফলে তিনি নিঃস্ব হয়েছেন, বিশ্ববিশ্রুত হননি। মরবার সময় তিনি আমাকে হঠাৎ অনুরোধ—হ্যাঁ, অনুরোধই বলতে পারিস, করে গেলেন, বললেন —মু, (আমাকে 'মু' বলেই ডাকতেন—আমাদের বংশের ধারা হলো আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এক এক জনের একটি 'কোড'নাম রেখে থাকি) তুই আমার অপূর্ণ আকাংক্ষা মেটাস। দেশের দশের একজন হবার জন্মে নিজেকে তৈরী কর্। বিশ্ববিখ্যাত হবার সাধনা কর্। আমাদের দু'পুরুষের এই বাসনা যেন ব্যর্থ না হয়। তুই আমার একমাত্র সন্তান,—তোকে আমি মরার সময় এই অনুরোধ করছি—বাকীটা তিনি আর বলতে পারেন নি।

ছোট্ট একটি ভাবাবেগের ঘটনা—নিছক sentimental; কিন্তু এর সংগে বাবার মৃত্যু জড়িয়েছিল বলে মনে বড্ড লেগে গেল। রাজনীতিবিদ্ হবার আকাংক্ষায় তাঁকে অধীর হতে দেখেছি। আমাকেও এই রাজনীতিতে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তখন থেকেই একটা ব্রত নিলাম মনে মনে।

সেই ব্রত সাধনাই হচ্ছে আমার জীবন। কি সেই ব্রত একথা আমি কোনোদিন প্রকাশ করিনি, আর তোরাও আমার জীবনচর্যা লক্ষ্য করে জানতে চাসনি আমার জীবন-পথের লক্ষ্য কি, আমার ব্রত কি! তোরা বুঝতে পারিস নি বলেই জানতে চাস নি। এই ব্রত আমাকে নিতে হয়েছে—বাধ্য হয়ে, আমি বিকৃতদর্শন বলে।

চেহারাটা আমার পংগু বলেই বোধ হয় বাইরের জগতে যে বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত জীবন—সে-জীবনের প্রতি কোনো উৎসাহ আমাকে ব্যয় করতে হয়নি। ফলে সাধারণ বালক-বালিকার চেয়ে বুদ্ধি ও মননের দিকে সেই উৎসাহকে জমাতে পেরেছি। আমি যে বুদ্ধিতে সাধারণের চেয়ে একটু অন্যরকম—তার মূল কথা কিন্তু এখানে। সে-কথা যাক।

বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলে আমার এই পংগুত্ব পদে পদে বাধা দেবে। আমি জানি এই চেহারা নিয়ে বিজ্ঞানী বীর হওয়া যায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের গবেষণা-ঘরে বসে রিসার্চ করে জগৎ-কল্যাণের জন্যে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি, সফলতাও পাওয়া যায়, কিন্তু সেই খ্যাতির মোহ আমাকে পাগল করেনি। লেখক হবার এলেমও ছিল না—এমন নয়। লেখকের পক্ষেও সুপুরুষ হবার প্রয়োজনীয়তা নেই, তাই গুপ্ত নামে লিখেও যাঁরা অমর হন, তাঁদের ক্ষোভের কারণ থাকে না। কিন্তু মুমূর্ষু পিতার অন্তিম অভীপ্সার কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। তিনি রচনাসৌকর্যের বিনিময়ে খ্যাতি উপার্জন করতে ইংগিত করেন নি। বিশ্ববিশ্রুত হবার সাধনায় আমাকে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন।

আমাকে বাইরে বেরোতে হয় না। তুইও জানিস যে আমি বরাবরই ঘরকুণো। দেহবিকৃতির জন্যে সকলের দৃষ্টিভাজন বা করুণাপাত্র হওয়ার চেয়ে বাড়িতে বসে থাকা বাঞ্ছনীয়। অলস মস্তিষ্ক যে শয়তানের কারখানা—সে-কথাটা আদৌ মিথ্যে নয়। আমাকে দিয়ে আমি এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারি। ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম—একজন সুপুরুষ ছেলেকে ভর করতে হবে। তার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সার্থক করে তুলবো। মনের মতো তাকে গড়ে-পিটে মানুষ করে নেব।

নিজে যদি রাজনীতিবিদ্ হয়ে, দেশনেতা হয়ে বিখ্যাত না হতে পারি—তাতে দুঃখ নেই, যদি আমি আর-একজনকে আমার মন দিয়ে আমার মনন দিয়ে, আমার শিক্ষা দিয়ে আমার দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে পারি—তবে বাবার আকাংক্ষার কিছুটা পূর্ণতা আনতে পারবো।

বিজ্ঞানবিদ্ বা সাহিত্যিক হবার প্রবণতা যখন নেই, ভেতর থেকে সাহিত্যকর্ম বা বিজ্ঞান সাধনার জন্যে সত্যিই কোনো অনুপ্রেরণা পেলাম না, তখনই একটি মাধ্যম খুঁজতে লাগলাম—নেপথ্য-লোকে থেকে বাইরের রংগমঞ্চে তাকে খ্যাতিমান করে তুলবো। মনের মধ্যে এই মতলব এসে বাসা বাঁধলো। দুষ্টু ভূতের মতো এই ইচ্ছা সর্বদা আমাকে জ্বালাতন করে মারতে শুরু করলে—আমি স্পষ্ট যেন শুনতে পাই—'কিরে মুকুন্দ, তোর ব্রতসাধনার উদ্‌যাপনের জন্যে একটি মাধ্যম এখনো গ্রহণ করলি না।' মাঝে মাঝে আমি যে চমকে না উঠেছি—এমন নয়, কিন্তু নিজেকে আবার বুঝ দিয়েছি—ভয়ের কিছু নেই, আমাকে এগোতেই হবে, নিজের কিছু না হোক, নিজের প্রচেষ্টার সার্থকতা আসুক, নিজের তৈরী লোকটি বিশ্বে আদৃত হোক। আমি স্রষ্টার আনন্দ চাই!

এই রকম সাত পাঁচ ভাবি, আর এদিক ওদিক তাকাই, চোখ দুটো যেন কাকে খুঁজে বেড়ায়। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে,—সর্বত্র আমি যেন একজনকে খুঁজছি! রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছিস না—পরশ পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই খ্যাপা,—আমিও খ্যাপার মতো সেই রকম পরশ পাথর পাবার আশায় মনুষ্যলোকের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরলাম।

একদিন দক্ষিণ কোলকাতায় লেকের ধার থেকে ফিরছি; দেখি ছেলেদের একটা ফাইন্যাল ফুটবল ম্যাচ্ হচ্ছে। বেশ ভিড় জমেছে। আমাকে করুণা করে অনেকেই জায়গা ছেড়ে দিলে। ম্যাচ্‌টা শেষ হতেই আবিষ্কার করলাম শিবেনকে, মাঠের মধ্যে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে সে একটা মেডেল পেলে। কি সুন্দর ফুটফুটে চেহারা, তার ওপর খেলার কী অপূর্ব কলাকৌশল! এই শিবেনকে চোখে লেগে

গেল—আমি যে মাধ্যম খুঁজছিলাম—কার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবো এখন বুঝতে পারলাম! ব্যস্ খ্যাপা পরশপাথর পেয়ে গেল, চিনতে কিন্তু ভুল হল না। শিবেনকে পেয়ে গেলাম।

সুপুরুষ সুন্দর ছেলে শিবেন—ওর পেছনে লোক লাগিয়ে জানলাম—ছেলেটি তার কাকার বাড়িতে থাকে। ওস্তাদ খেলোয়াড়, স্কুলের ট্রফি পেয়েছে। টালীগঞ্জে তখন আমাদের রাউত-নগর-প্রতিষ্ঠা সবে শেষ হয়েছে। রাউত হচ্ছে আমার বাবার 'কোড' নাম। এই কোড নামের একটা ইতিহাস আছে, সেটা এখানে অপ্রাসংগিক—তাই তোকে বিস্তৃতভাবে জানাচ্ছি না। কিন্তু টালীগঞ্জে আমরা আসার কিছুদিন পরেই খবর পেলাম শিবেনরা চলে গেল ল্যান্সডাউন রোডে—বাড়ি করে। যাই হোক, আমি ওকে ছাড়লাম না। শনির মতো, বরং বলতে পারিস কলির মতো ওকে গ্রাস করে বসলাম। গ্রাস শব্দটা কি ঠিক হলো? তা—একরকম গ্রাস করাই ত', হ্যাঁ—গ্রাস কথাটা বলতে পারিস! রাহু যেমন ঢেকে রাখে চন্দ্র-সূর্যকে, তেমন করেই আঁকড়ে ধরলাম শিবেনকে। খেলাধুলোয় যত তাকে উৎসাহ দিয়েছি, তার চেয়ে ঢের বেশী সময় ওর জন্যে ব্যয় করেছি ওর লেখাপড়ার ব্যাপারে। পড়া মুখস্থ করানো, বুঝিয়ে দেওয়া, এমনকি কোনো কোনো পরীক্ষায়—আজ আর বলতে বাধা কি, অসদুপায়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া—সবই আমাকে করতে হয়েছে। শিবেনের কেরিয়ার তৈরী করাই আমার নেশা হয়ে উঠলো। দিন নেই, রাত নেই, আমি শুধু শিবেনের পড়াশুনোর চিন্তায় ডুবে গেলাম। কি করে শিবেনকে মানুষ করবো—এই আমার এক চিন্তা হয়ে দাঁড়ালো। ওর মধ্যে দিয়ে আমার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সার্থক রূপ গ্রহণ করবে। পিতৃদেবের অকৃতার্থ বাসনা চরিতার্থ করছি ভেবে নীতিবিরুদ্ধ কাজ যে না করেছি, তা নয়।

তুই বোধ হয় এসব জানিস অন্তত এখন আন্দাজ করতে পারিস—তাই বিস্তৃতভাবে সে-কথা তোকে লেখার কোনো মানে হয় না। শিবেন রইলো স্টেজে, আমি নেপথ্যে। শিবেন প্রকাশ্যে, আমি ওর আড়ালে। শিবেনকে আমি এই জন্যেই চেয়েছিলাম।

কিন্তু শিবেনটার কোনো ক্যারেক্টার নেই। নইলে ও খেলাকে নিয়ে মেতে ওঠে! বড় জীবনের ইংগিত আমি ওকে দিয়েছি, মহাজীবনের হাতছানিও শিবেন দেখতে পেয়েছে—তবু খেলো চটুলতা শিবেন কখনো ত্যাগ করতে পারেনি।

খেলাকে যদি শিবেন বিয়ে করতো তবে আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যেত—তাই পয়সা-কড়ি খরচ করে শিবেনকে আমি সেই বিপত্তি থেকে রক্ষা করি, খেলার হাত থেকে ওকে বাঁচাবার জন্যে কাশ্মীর পাঠাই। খেলারও একটি গতি করে দিই, শিবেনের দৃষ্টি থেকে ফুলটুসিকে দিলাম সরিয়ে।

অবশেষে আমি রুচিরার সংগে ওর বিয়ের ঠিক করে দিই। একটি মেয়েকে ভুলতে গেলে আরেকটি মেয়ের প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বেশী কার্যকর অস্ত্র। এক নারীর বদলে অন্য নারী—এমন অমোঘ মন্ত্র আর হয় না।

এই রুচিরাকে তোর বোধ হয় মনে আছে। শিবেনের সংগে একদিন তুই চুঁচড়োয় গিয়ে ওকে দেখেও এসেছিস—সেই রুচিরা। আমাদের নিক্ষ্—তোকে যে আবার যেতে নেমতন্ন করেছিল।

দিল্লীতে শিবেনকে পাঠানো দরকার হয়ে পড়লো। কেন জানিস? বাংলাদেশে ওর যেমন সুনাম ছিল—ঠিক সেইরকম একটি বদনামও হচ্ছিল হাই-সার্কেলে। যেখানেই নিজে থেকে কিছু করার দরকার হয়—চালে ভুল করে বসে। এত করে তালিম দিই, তবু নিজ থেকে যদি একটা কিছু করতে পারে। উল্টো পাল্টা করে দেয়। আজকের দিনে যে-কোনো ব্যাপারই হোক—রাজনৈতিক চালের সংগে তা সমাধা করতে হবে। এই যুগটা হচ্ছে পলিটিক্সের যুগ; যুগই বল হুজুগই বল, পলিটিক্সকে মর্যাদা দিয়েই সে কথা বলতে হবে। একজনের সংগে আলাপও করবি তুই—তাও ভেবেচিন্তে করতে হবে। এখানে হকি য়্যাসোসিয়েশন এবং ক্রিকেট-বোর্ডের মিটিঙে এমন সব কথা বলে ফেলেছে—যাতে ওর জনপ্রিয়তা প্রায় যেতে বসেছে। পাশা-খেলা জানিস?

পাকা ঘুঁটিকে কাঁচিয়ে ফেলা? অনেক কষ্ট করে দেশের স্পোর্টস্-নিয়ন্তাদের একজন করে পাঠানো গিছলো শিবেনকে, বাংলাদেশের খেলাধুলো'র জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তাকে ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে বিখ্যাত করে তোলা সহজ হয়েছিল, কিন্তু সে নিজেই যেন কেমন হয়ে পড়ছে। যেখানেই নিজে থেকে কিছু করতে যায়, সেখানে সে ভাল সামলাতে পারে না।

শিবেনকে স্পোর্টস বোর্ডের মেম্বার করে দিয়ে ভেবেছিলাম একটা ধাপ এগোনো গেল। একটা মাইল-স্টোন পেরোনো গেল। কিন্তু যাদের মুখপাত্র হয়ে ও গেল স্পোর্টস্-বোর্ডে—তাদের কথা সে সেখানে গুছিয়ে বলতে পারলে না। ছোট ছোট ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করার কথা, কিন্তু সে বড় ক্লাবের হয়েই কথা বলে। শিবেন আমার কথা শুনে গিয়েছিল—সেইভাবে বক্তৃতা করেছিল—তাই ছোট ছোট অনুমোদিত ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিত্ব করার একমাত্র অধিকারী বলে সকলে তাকে জয়মাল্য দিয়েছিল। কিন্তু শিবেনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নেই, অবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না। আমি জানি না কাদের পাল্লায়, কোন্ দলে ভিড়ে সে এমন এক কাঁচা কাজ করে ফেললে—যাতে তার সমস্ত খ্যাতিটুকু বালির বাঁধের মতো ধ্বসে পড়লো। সকলের মুখে ওই এক কথা—শিবেনও ডিগবাজি খেতে জানে। সকলে বলতে লাগলো—ছোট ক্লাবের টিকিটে এসে বড় ক্লাবের আসনে গিয়ে খোসামোদ করে। ও বুঝতেই পারলো না যে, কিসে কী হয়। সুতরাং ওকে দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে খ্যাতিমান করে তোলার সাধনা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়। নিরপরাধ হলেও—একবার যখন বদনাম রটে যায় তখন পেছনে শক্তিশালী পার্টির টিকিট না থাকলে স্বতন্ত্র মানুষ আর উঠে দাঁড়াতে পারে না—রাজনীতিতে ত' নয়ই।

যাই হোক, এর পর অনেক চেষ্টা-চরিত্রি করে ওকে আমি দিল্লীতে আনার ব্যবস্থা করলাম। যাতে এখানে ও কয়েকটা ক্লাবের মাধ্যম দিয়ে দিল্লীতে ভারত-সরকারের ক্রীড়াদপ্তরে সর্বোচ্চ পদ পায় তার চেষ্টা চললো। রুচিরার বাবার সংগে সেই রকম এক চুক্তিপত্র করলাম।

ওদের একটা ফার্ম ছিল, রুচিরার কাকার, আমি সেই ফার্মের লিগ্যাল য়্যাড্‌ভাইসর হবো কিন্তু তৎপরিবর্তে শিবেনকে ভারতের ক্রীড়া-জগতের বিধায়ক করতে হবে, এবং সম্ভব হলে আরো কোনো গুরুতর পোস্টে বহাল করতে হবে।

শিবেনকে দেখে রুচিরার পছন্দ হলো। অপছন্দ হবার কথা নয়। স্নিগ্ধ, সুশ্রী, সুতনু শিবেনের, মাদকতায় সে উজ্জ্বল। শিবেনেরও পছন্দ হলো। শিবেনের কথা ছেড়েই দে; ওটা ত' স্কাউণ্ড্রেল-বিশেষ। খেলাকে নিয়ে যে ওই কাণ্ডটা করতে পারে, রুচিরাকে তার অপছন্দ হবে না—জানতাম। রুচিরাকে দেখেই শিবেনটা এখনই বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাতে যায়। আমি বললাম—রুচিরাকে পেতে গেলে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। এ আর খেলা নয়। আমি রুচিরার মেজাজ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম—তাই শিবেনকে রুচিরার যোগ্য করে তুলতে লাগলাম। প্রেমিকের অভিনয়ে নেপথ্য ভূমিকা গ্রহণ করা আমার বাকী ছিল—এবার তাও বাদ গেল না, ষোলকলা পূর্ণ হলো! ছাত্র, বক্তা, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসেবী—অবশেষে প্রেমিক। সব রকম পার্টই করতে হয় জীবনে, আমরা—মানুষেরা যে অভিনেতা, জগৎটা-না স্টেজ! মহাকবির বাণী কি আর মিথ্যে হয়? প্রেমিকের ভূমিকাতেই নামলাম! আমি শিবেনের মুখের ভাষা জুগিয়ে দিই, শিবেনকে শেখাই এই কথার পৃষ্ঠে এই কথা বলতে হয়, প্রেমের ব্যাপারে কখনো সরাসরি কিছু বলিস না, চাপান দিবি কথার প্যাঁচে, তোকে চাপান দিলে তুই সেই প্রসংগক্রম ধরে অন্য প্রশ্ন করবি। প্রেম মানে আবোল-তাবোল বকা আর কি—এক ধরনের বিলাস-লালিত পাগলামি, পাগলামি যদি না বলতে চাস ত' বলিস—রোগ। মনের ব্যাধি! আমি প্রেমের একটা দিক সম্পর্কে বেশ ভালো করে শিবেনকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম।

কত কাজ বেড়ে গেল। সাজপোশাক বাৎলে দিই,—এই পোশাকে এসময় গেলে রুচিরা হাসবে, এ পোশাক এখন চলে না। তোর চেহারা এত সুন্দর, তুই এই রঙের স্যুট পর্, এই রকমের ডোরা-কাটা টাই।

পোশাকেরও একটা শিল্প আছে, শোভন পোশাক সুন্দর মানুষকে সুন্দরতর করে তোলে। শিবেন এ কথা মানে, কিন্তু পোশাক সম্পর্কে মানানসই সৌন্দর্যকে রপ্ত করতে পারে না। ইদানীং দেখলাম যে শিবেন নতুন পোশাক পরলেই রুচিরাকে তা দেখাবার জন্যে ছুটতো। শিবেনের পোষাক-পরিধান যেন রুচিরার দেখার জন্যে। রুচিরার মনের মতো সুন্দর হলেই শিবেনের পোশাকের সার্থকতা। আমিও যথাসাধ্য শিবেনের পোশাক পরিচর্যার ভার নিলাম। এ কাজ আমি নেপথ্যে করেছি। তোরা এর খবর জানিস না।

চালচলন পর্যন্ত শিখিয়ে দিতে হয়েছে। শিবেনটা মেয়েদের সংগে মেশে বটে, কিন্তু প্রেমের আলম্বন বা বিভাবের কিছুই বোঝে না। সে মেয়েদের বিষয়ে চট করে একটা কিছু করে বসে। তাকে বোঝাতে লাগলাম—মেয়েদের ব্যাপারে উগ্র হোস না। এ আর ফুলটুসি নয় যে সে নিজেও শিবেনের সংগে খেলতে নেমে যাবে, শিবেনকে সে খেলাবে রুচিরার মর্যাদাবোধে আঘাত করিস না, শিবেন; এইরকম ভাবে চলবি, এই সুরে তান তুলবি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজনের মধ্যে দিয়ে প্রেমের ছলনা করা যে কিরকম উত্তেজনা-প্রবণ আর আবেগবিহ্বল, তা তুই বুঝতে পারবি না, ভুক্তভোগী ছাড়া এ কেউ বোঝে না। প্রত্যক্ষভাবে কোনো নারী নেই, পরোক্ষে শুধু প্রেমের অভিনয়;—আর এই—অভিনয় বিশেষ করে রুচিরার মতো বিরলপ্রাপ্তি সুন্দরী নারীর সংগে আমার মতো কদর্যদর্শন এক পুরুষের! শিবেন যেন তোতাপাখি, সমাসবদ্ধ পদের মাঝখানে ছোট্ট একরত্তি যেমন হাইফেন থাকে—ও যেন কতকটা সেই রকমের।

অনেকদিন ধরে রুচিরা আর শিবেনের কোর্টশিপ চললো, অনেক অভিনয়, অনেক ছলাকলা। তুই লেখক মানুষ, সে সব তুই কল্পনা করে নে, লিখলে মস্ত একটা উপন্যাস হয়ে দাঁড়াবে। শিবেনের সংগেই বিয়ে হলো রুচিরার। শিবেন আর রুচিরা—তুই দেখেছিস কিনা জানি না—কাগজে ওদের বিয়ের ছবি বের হয়েছিল। একজোড়া

অমন সুন্দর নরনারী অনেকদিন কেউ দেখেনি—সকলে বললে। আমি বলি—অনেকদিন কেন, আর কখনো কেউ দেখেনি। হরপার্বতীর সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে সাহিত্যে, ওদের দুজনের ভাগ্যে এই বর্ণনাই প্রাপ্য। ইলাসট্রেটেড্ উইক্লিতে ছাপা নবদম্পতির ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবি—আমার এই কথা কতদূর সত্যি। শিবেনের পাশে রুচিরাকে কত সুন্দর মানিয়েছে। কালিদাসের কাল হলে এই বিয়ের মিলন-লগ্ন কত রোমান্টিক হয়ে কবির কাব্য-বস্তুতে চিরন্তন হয়ে থাকতো! তোরা সৃষ্টিশীল শিল্পী হলে হবি কি—তোদের কলমের উপজীব্য বিষয় হয়ে এই সৌন্দর্য ধরা পড়ে না।

মুশকিল হলো এই বিয়ে নিয়ে। রুচিরা সুন্দর শক্তিমান য়্যাপোলোকে খুঁজছিল, শিবেনের মধ্যে তার ঈপ্সিত পুরুষকে পেয়েছে বলে তার একটা বদ্ধমূল ধারণা হলো। রুচিরার আশা বড়—দেখতে যেমন কন্দর্প, বুদ্ধিতেও তেমন ক্ষুরধার হবে—এই তার স্বামীর মডেল। কিন্তু শিবেন বুদ্ধিতে বার্হস্পত্য লাভ করেনি। এদিক থেকে এখনো সে আমার ছাত্রস্থান।

প্রথম ধাক্কা রুচিরার কাছ থেকে এল অতর্কিত অবস্থায়। গরমের সময়ে হিমালয়ের ওপর ল্যান্সডাউন পাহাড়ে বেড়াতে যাবার ঠিক আগে রুচিরা শিবেনের একটা স্যুট তৈরী করাবার জন্যে শিবেনকে চাপ দিলে বিশেষভাবে। শিবেন তখন বলেছিল,—মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করি—চকোলেট রঙে আমাকে মানাবে ভালো, না পানামার স্যুট করাবো। মুকুন্দের পছন্দ না হলে—

ধমক দিয়ে রুচিরা বাধা দিয়েছিল; রুষ্ট কণ্ঠে বললে—তুমি থামো। নিজের বুদ্ধিতে কুলোয় না! বন্ধুর পরামর্শ ছাড়া বুঝি তোমার চলে না?

আমি বলতে পারবো না ঠিক কী কী কথা কাটাকাটি হয়েছিল। শিবেন যথাযথ সব আমার কাছে বর্ণনা করতে পারেনি। মোটমাট সেই প্রথম রুচিরা সন্দেহ করতে শুরু করলো যে, শিবেন আমার ওপরই যেন সব বিষয়ে নির্ভর করে চলে। আমাকে ছাড়া শিবেনের

চলে না। নিজস্বতা সে জানে না, শিশুর মতো অসহায়ভাবে আমাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। সামনে শিবেন—আর তার আড়ালে আমি আছি। কোনোদিন হয়তো আমার এ-কথা আর প্রকাশিত হবে না, —তাই তোকে একটু বিস্তারিত জানিয়ে যাচ্ছি। চিরদিনের জন্যে এ পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে কাকে আর মনের কথা বলে যাই বল্! তোকে কোথায় যেন মনের মধ্যে আত্মীয় বলে ভেবেছি। তাই স্নেহের এই অত্যাচারটা তোর ওপর চালালাম।

উনচল্লিশ বছর আমার বয়স। যৌবন কোন ফাঁকে এসে চলে গেছে —জানতে পারিনি। পংগুদেহ মানুষের আবার যৌবন কি—হয়তো একথা বলবি। আমিও তাই বলি রে—আমার আবার যৌবন কি! কই, অকৃপণ বসন্তবাতাস ত' একবারও অতর্কিত প্রীতির সম্ভাষণ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়নি! ভুলেও কি সে একবার আমার মনের দোরে হানা দিতে পারতো না? ছুটো ঝরা শুকনো ফুলের গন্ধও কি নাকে ঠেকতে নেই? কোনদিন সে দুর্ঘটনাও ঘটে নি। প্রকৃতির রাজ্যে কত ফুলের কত অপচয়—এদিকে ওদিকে দেখছিস ত',—আমার জন্যে আমার নাম করে কি কৃষ্ণচূড়ায় একদিনও আগুন জ্বলতে পারতো না? লীলাকমলের দলগুলিতে গোলাপী আভা কি একমুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বলতর হতে পারতো না, আমার চোখে রোশনাই জ্বালতে পারতো না। পংগু হলেও মানুষ ত' আমি! মনের দিক থেকে অন্তত গোটা একটা মানুষ!

বিকৃতদেহ ব্যক্তির জীবনে কি প্রেমের অমৃতযন্ত্রণার ছোঁয়াচ লাগে না? মদনদেবের অসতর্ক বিশিখের বিস্ময়কর আক্রমণ কি লাগতে নেই? বসন্তের সেই হাওয়ায় রতিপতির বিষম বিশিখ ভেসে আসে, আর প্রেমের সেই অমৃতযন্ত্রণার স্পর্শ আমাকেও তবু লাগে রে,—কিন্তু ফল্টু, ঐ পর্যন্তই, এর ত' আর কোনো প্রতিকার নেই। ধিকি-ধিকি জ্বলে, ওপর থেকে বোঝা যায় না। আয়োজনের উৎসাহ থাকে না বলেই সে বোধহয় দৃষ্টির অগোচর হয়, ইটের পাঁজার মতো বাইরে

অমন সুন্দর নরনারী অনেকদিন কেউ দেখেনি—সকলে বললে। আমি বলি—অনেকদিন কেন, আর কখনো কেউ দেখেনি। হরপার্বতীর সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে সাহিত্যে, ওদের দুজনের ভাগ্যে এই বর্ণনাই প্রাপ্য। ইলাসট্রেটেড্ উইক্‌লিতে ছাপা নবদম্পতির ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবি—আমার এই কথা কতদূর সত্যি। শিবেনের পাশে রুচিরাকে কত সুন্দর মানিয়েছে। কালিদাসের কাল হলে এই বিয়ের মিলন-লগ্ন কত রোমান্টিক হয়ে কবির কাব্য-বস্তুতে চিরন্তন হয়ে থাকতো! তোরা সৃষ্টিশীল শিল্পী হলে হবি কি—তোদের কলমের উপজীব্য বিষয় হয়ে এই সৌন্দর্য ধরা পড়ে না।

মুশকিল হলো এই বিয়ে নিয়ে। রুচিরা সুন্দর শক্তিমান য়্যাপোলোকে খুঁজছিল, শিবেনের মধ্যে তার ঈপ্সিত পুরুষকে পেয়েছে বলে তার একটা বদ্ধমূল ধারণা হলো। রুচিরার আশা বড়—দেখতে যেমন কন্দর্প, বুদ্ধিতেও তেমন ক্ষুরধার হবে—এই তার স্বামীর মডেল। কিন্তু শিবেন বুদ্ধিতে বার্হস্পত্য লাভ করেনি। এদিক থেকে এখনো সে আমার ছাত্রস্থান।

প্রথম ধাক্কা রুচিরার কাছ থেকে এল অতর্কিত অবস্থায়। গরমের সময়ে হিমালয়ের ওপর ল্যান্সডাউন পাহাড়ে বেড়াতে যাবার ঠিক আগে রুচিরা শিবেনের একটা স্যুট তৈরী করাবার জন্যে শিবেনকে চাপ দিলে বিশেষভাবে। শিবেন তখন বলেছিল,—মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করি—চকোলেট রঙে আমাকে মানাবে ভালো, না পানামার স্যুট করাবো। মুকুন্দের পছন্দ না হলে—

ধমক দিয়ে রুচিরা বাধা দিয়েছিল; রুষ্ট কণ্ঠে বললে—তুমি থামো। নিজের বুদ্ধিতে কুলোয় না! বন্ধুর পরামর্শ ছাড়া বুঝি তোমার চলে না?

আমি বলতে পারবো না ঠিক কী কী কথা কাটাকাটি হয়েছিল। শিবেন যথাযথ সব আমার কাছে বর্ণনা করতে পারেনি। মোটমাট সেই প্রথম রুচিরা সন্দেহ করতে শুরু করলো যে, শিবেন আমার ওপরই যেন সব বিষয়ে নির্ভর করে চলে। আমাকে ছাড়া শিবেনের

চলে না। নিজস্বতা সে জানে না, শিশুর মতো অসহায়ভাবে আমাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। সামনে শিবেন—আর তার আড়ালে আমি আছি। কোনোদিন হয়তো আমার এ-কথা আর প্রকাশিত হবে না, —তাই তোকে একটু বিস্তারিত জানিয়ে যাচ্ছি। চিরদিনের জন্যে এ পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে কাকে আর মনের কথা বলে যাই বল্! তোকে কোথায় যেন মনের মধ্যে আত্মীয় বলে ভেবেছি। তাই স্নেহের এই অত্যাচারটা তোর ওপর চালালাম।

উনচল্লিশ বছর আমার বয়স। যৌবন কোন ফাঁকে এসে চলে গেছে —জানতে পারিনি। পংগুদেহ মানুষের আবার যৌবন কি—হয়তো একথা বলবি। আমিও তাই বলি রে—আমার আবার যৌবন কি! কই, অকৃপণ বসন্তবাতাস ত' একবারও অতর্কিত প্রীতির সম্ভাষণ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়নি! ভুলেও কি সে একবার আমার মনের দোরে হানা দিতে পারতো না? ছুটো ঝরা শুকনো ফুলের গন্ধও কি নাকে ঠেকতে নেই? কোনদিন সে দুর্ঘটনাও ঘটে নি। প্রকৃতির রাজ্যে কত ফুলের কত অপচয়—এদিকে ওদিকে দেখছিস ত',—আমার জন্যে আমার নাম করে কি কৃষ্ণচূড়ায় একদিনও আগুন জ্বলতে পারতো না? লীলাকমলের দলগুলিতে গোলাপী আভা কি একমুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বলতর হতে পারতো না, আমার চোখে রোশনাই জ্বালতে পারতো না। পংগু হলেও মানুষ ত' আমি! মনের দিক থেকে অন্তত গোটা একটা মানুষ!

বিকৃতদেহ ব্যক্তির জীবনে কি প্রেমের অমৃতযন্ত্রণার ছোঁয়াচ লাগে না? মদনদেবের অসতর্ক বিশিখের বিস্ময়কর আক্রমণ কি লাগতে নেই? বসন্তের সেই হাওয়ায় রতিপতির বিষম বিশিখ ভেসে আসে, আর প্রেমের সেই অমৃতযন্ত্রণার স্পর্শ আমাকেও তবু লাগে রে,— কিন্তু ফল্টু, ঐ পর্যন্তই, এর ত' আর কোনো প্রতিকার নেই। ধিকি-ধিকি জ্বলে, ওপর থেকে বোঝা যায় না। আয়োজনের উৎসাহ থাকে না বলেই সে বোধহয় দৃষ্টির অগোচর হয়, ইটের পাঁজার মতো বাইরে

কোনো আগুনের চিহ্ন ছড়ায় না। যা-কিছু দাহিকা শক্তি—তা সে ভেতরকে পুড়িয়ে রাঙা করার জন্যে।

শিবেনের মাধ্যমে আমার প্রেমিক জীবনের তৃষ্ণা ত' মেটবার নয়! এই নব জাগ্রত যন্ত্রণাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম, নিজের মনকে বোঝালাম। আমি এদিকে আর বেশী মাথা ঘামাইনি। কারণ ঠিকই বুঝেছিলাম যে শিবেনের মধ্যে দিয়ে আমি আমার বিকৃত জীবনের আকাংক্ষা-রাঙা সার্থকতার পথে পৌছতে পারবো। কিন্তু প্রেমের যাত্নস্পর্শের সুধা ত' তার মাধ্যমে পান করা যেতে পারে না। এ বিষয়ে মনকে গোড়াতেই বেঁধে নেওয়া ভালো। গোঁজামিলের একটা বুঝ দিয়ে মনকে শক্ত করে নিলাম।

শিবেন সুপুরুষ, কিন্তু চিন্তাহীন, ব্যক্তিত্বহীন। আমার পৌরুষ আছে, বুদ্ধি আছে, বিচক্ষণতা আছে—কিন্তু চেহারা নেই। তাই আমরা দু'য়ে মিলে একটু একটু করে এক হয়ে গেলাম। মিলিত সেই একের জীবনে এল রুচিরা। শিবেনের চিন্তা আমারই চিন্তা, তার কথার পেছনে আমারই কণ্ঠস্বর। তার চলন-বলন, আচার-আচরণ, সব কিছুর নেপথ্যে আমার স্বাক্ষর। আমি ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না, একটি কথাও বলতে পারে না; সে ছাড়া এখন আমারও দাঁড়াবার জায়গা নেই। সে আমার মন নিয়ে চলে, আমি উপভোগ করি তার সৌম্য চেহারার কল্পিত আনন্দ। শিবেনকে ধীরে ধীরে আমি আমারই অংগীভূত বলে ভাবতে লাগলাম। আমার কাছে সে অপরিহার্য হয়ে গেল।

এখন, ধীরে ধীরে রুচিরা যদি আমার এই নেপথ্যচারিতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, সে কী ভাবতে পারে—বল্ তো? মনের দিক থেকে আমাকে আর বাইরের সৌন্দর্যের দিক থেকে শিবেনকে কি একটা মেয়ে একই সংগে পছন্দ করতে পারে? অন্তত কোনো মেয়ের সে-রকম করা সম্ভব নয়। নারীমনের খবর আমি যতটা জানি—আমি অবশ্য সেদিক থেকেই বলছি।

আমি ত' বেশ জানি যে আমার এই বিকৃতদেহের জন্যে, বিশ্রী

চেহারার জন্যে কোনো মেয়ে আমাকে কখনো একবারও স্পর্শ করবে না, করুণা করেও না। কেন করবে?—সে জিনিস আমি আশাও করি না। তাই হয়তো মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে আমার, চিন্তাধারা রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে। দেহের বিকৃতি কি মনে পেয়ে বসেছে নাকি?—যাকে তোরা পার্‌ভার্‌সন্‌ বলিস—আমি কি মনের দিক থেকে সেই বিকৃতির অধিকারী হয়ে পড়েছি? কেন এ প্রশ্ন করছি জানিস?—ইতিমধ্যে আমি কখনো কখনো শিবেনকে হিংসা করে ফেলেছি—ঘৃণাও যে না করেছি, এমন নয়। আমি মনে মনে শিউরে উঠলাম।

একি হলো আমার! রুচিরার সংগে শিবেন ক'টা দিন বাইরে কাটিয়ে এল—ভারী বিশ্রী লাগলো আমার। কোনো কাজে মন লাগে না, সন্ধ্যে-সকাল, দিন-রাত কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। স্বামী-স্ত্রীতে তারা গেছে বেড়াতে—তাতে আমার মাথার বেদনা ধরার কোনো হেতু নেই—আর বোধ হয় বুঝতে পারছিস—এ মাথা-ব্যথা সারিডন কি য়্যাসপ্রোতে সারবার নয়। পরিপূর্ণ হিংসাই এর জনক। তোদের মুকুন্দের অধঃপতনটা একবার ভাব। প্রেম মানুষকে সুন্দর করে, মানুষের মনকে উদার এবং উন্নত করে, কিন্তু সেই সংগে সংগে প্রেম মানুষকে হিংসুকও করে দেয়, মনকে নীচতার আশ্রয় করে গড়ে তোলে!

আমি চেয়েছি শিবেন বড় হোক, বিখ্যাত হোক—এবং তাকে দশজনের একজন করে তোলাই আমার সাধনা। সেই সাধনা থেকে আমি সরে আসছি। শিবেন বড় হোক বা না হোক, আমার ক্ষুধার্ত চেতনার তৃপ্তির জন্যেই যেন শিবেনকে আমার প্রয়োজন। হাতের পুতুলকে যেমন বাজীকর নাড়িয়ে নাড়িয়ে খেলা দেখায়, শিবেনকে আমি কতকটা সেই রকম ক্রীড়নক ভাবতে লাগলাম।

শিবেনকে বড় করে বিখ্যাত করে তোলার সাধনা থেকে একি বিষ আমাকে ধ্বংস করতে চাইছে! মনটা কাতর হয়, কিসের এক অব্যক্ত বেদনায় মন টনটন করে, আর শিবেনকে হিংসে করি। যুক্তি দিই—শিবেন হলো আমার প্রকাশ, বাইরের রূপ, ঈর্ষাবস্তু নয়।

কিন্তু তবু ভাবি আমরা দু'য়ে মিলে যখন এক—তখন জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিবেন একা কেন ভোগ করবে? প্রেমের ফসল চাষ করার ব্যাপারে আমিও ত' একজন শিল্পী, তার মূল্য থেকে শিবেন কেন ঠকাবে আমাকে?

তোকে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—আমার এই সময়কার মনোবেদনা পারিস ত' বুঝে নেবার চেষ্টা করিস। তুই লেখক মানুষ—তোকে কল্পনা করে পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের মন বুঝে নিতে হয়—আমি আর বেশী কি বলবো?

প্রেমিক হিসেবেও শিবেন রুচিরার সংগে তাল ফেলে চলতে পারলো না। আমি না থাকলে শিবেন সর্বত্র দেখছি ফেল মেরে বসে—শুধু খেলাধুলো ছাড়া। ফুটবল ক্রিকেট খেলায় যে এত চতুর আর এত কুশলী, সে কি করে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে এমনধারা বোকা বনে যায়। রুচিরার কাছে শিবেন ধরা পড়ে যায়। যে কথাটি রুচিরা বলে—শিবেন তার যোগ্য উত্তর দিতে পারে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সায় দিয়ে যায়। জল উঁচু ত' উঁচু আর নীচু ত' নীচু—এই মনোভাব নিয়েই শিবেন রুচিরার সংগে মিশতে গেছে। ফলে রুচিরার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে—শিবেনের আড়ালটা অবলোকন করা। এতদিন যে বুদ্ধির চমক দেখিয়েছে শিবেন—সে মেধা কার? রুচিরা একটু একটু করে ঘেরাটোপ সরিয়ে ফেললো—দেখছি। শিবেনের পেছনে আমি লুকিয়ে রয়েছি—শিবেন হতভাগাটা বুঝি তাও থাকতে দেয় না। কাজে কথায় হাবে ভাবে সে ধরিয়ে না দেয়!

মাঝে মাঝে আমরা তিনজনে—রুচিরা, শিবেন আর আমি এদিক-ওদিকে বেড়াতে যেতাম, আগ্রা কি কুতুবমিনার, এমন কি ফতেপুর সিক্রী,—এ-কথা সে-কথা নিয়ে আলাপ হতো।

রুচিরা একদিন আমায় বললে—সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল,—নির্জন নিস্তব্ধ চারিদিক, শিবেন সংগে থাকলেও, সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল, এমন সময় রুচিরা আমার কাছে এসে বেশ মিহিস্বুরে বললে—আপনি এত নিপুণ

অভিনেতা—আগে এ তো জানতে পারিনি। স্টেজের অভিনেতাদের চট করে চেনা যায়—

অভিনেতা? কই না?—চমকে উঠলাম।

রুচিরা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে; স্নিগ্ধ হাসি, কিন্তু এক টুকরো হীরের মতই দীপ্তিশীল! হেসে নিয়ে সে বললে—আপনার অস্তিত্ব কিন্তু আমি আপনার বন্ধুর মধ্যেই লক্ষ্য করি। আপনি ওঁর চেহারায় অভিনয় করেন না?

অভিনয়—মানে, হ্যাঁ। ধরা পড়ে গেছি বুঝেই আমি বললাম—দেখুন, এই জগৎ, এই জীবন—সবই ত' অভিনয়, একদিক থেকে দেখলে।

ও—তাই বুঝি? রুচিরা একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বললে বোধ হয়।

তা নয়তো কি—মুখস্থ-করা কথার আবেগ যেমন করে ফেটে পড়ে, তেমনই অস্থিরতা নিয়ে আমি বলতে লাগলাম, আজ এই যে আমরা এখানে তিনটে প্রাণী রয়েছি, বিচিত্র মহাশূন্য আকাশের তলায়, রৌদ্ররঙে উজ্জ্বল চারিদিক, এই পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে যে উপলব্ধির পুষ্পরেণু মেখে মনকে রাঙিয়েছি—তার চিরন্তন কি মূল্য আছে? একটু ভালবাসা, একটু মন কেমন করা, একটু আকর্ষণ। কাছে টানা, মমত্ববোধ—এই ত'? সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ঠিক এই জিনিসটি ত' চলে আসছে—ফলে ফুলে দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা—শুধু দৃশ্যের পার্থক্য, নায়ক-নায়িকার তফাৎ। তাই কিনা বলুন? এখানে শিবেন আর রুচিরা, প্রাচীন যুগে হয়তো যক্ষ আর যক্ষপ্রিয়া। এখানে মিলন, সেখানে বিরহ। একই জিনিস, একই সুর। একই সেটের নায়ক নায়িকা; শুধু দৃশ্যপটের পালাগানের পরিবর্তন। অথচ এর কোনো শাশ্বত মূল্য নেই। অভিনয় নয়তো কি?

রুচিরা মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকালো। ঠোঁটের কোণে তার মিষ্ট স্নিগ্ধ এক পশলা হাসির বর্ষণ দেখলাম। হাসি যে নারীর কত বড় সম্পদ, তা রুচিরার এই রকমের হাসি না দেখলে বুঝবি

না। সুষমা অমৃত প্রভৃতি যে তুরীয় জগতের শব্দিত প্রকাশ, তার বাস্তব অভিব্যক্তি দেখলাম রুচিরার হাসিতে।

নারীকে ভালবাসার মতো প্রাণ আমার আছে। আমার মন, মগজ—সবই আছে। তবু প্রকৃতি আমাকে এক বিড়ম্বিত দেহ দিয়ে মেয়েদের প্রীতিকোমল সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। একটি রমণী রূপ-সৌন্দর্য বাদে আর যা চায় পুরুষের কাছে—তার সবই আছে আমার। অথচ তার একি অপচয়, একি ব্যর্থ বাজে খরচ? আর আমাকেও কি রকম কাঙাল করে রাখা হয়েছে।

রুচিরা বললে—জগতে সব কিছুই অভিনয় বলছেন?

নয়তো কি? আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম—জন্মমৃত্যুর মাঝখানে আমি যে কাজ করছি—তার রেশ নিয়ে আমিই মাতামাতি করছি। জমকালো অভিনয়—করুণ, সীতার বনবাসে জনকনন্দিনীর দুঃখে আমরা বিগলিত-হৃদয় হয়ে কাঁদি যখন, তখন সীতা গ্রীনরুমে সীতার সাজ ছেড়ে হয়তো থিয়েটারের ম্যানেজারের কাছে তার রেট বাড়ানো নিয়ে ঝগড়া করছে। মূঢ় দর্শক কিন্তু তখন ফোঁপাচ্ছে। আমাদের জীবনের ক্ষেত্রেও তাই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময় মানুষ করবেটা কি? স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, আশা-নৈরাশ্য, মমতা-করুণা, রাজ্যজয়, দেশপ্রেম, এভারেস্ট বিজয়, ইংলিশ-চ্যানেল অতিক্রম—এই সব কর্মে ব্যস্ত হয়। যাদের এ সব কাজে ভাত হজম হয় না, তারাও অন্য ধরনের কাজ নিয়ে মত্ত থাকে। কি করে অমুকের সর্বনাশ করবো, ওর ভিটেয় ঘুঘু চরাবো, প্যাকা ধানে মই দেব—এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। ভাল কাজই করুক, আর মন্দ কাজই করুক,—কাজের শেষে ড্রেস খুলে রেখে নেপথ্যে চলে যেতেই হবে। যারা এ নিয়ে বেশী ভাবে—তারা ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে না, বোঝে না যে মানুষ নামক জন্তু আসল জন্তুর মতো খাওয়া আর ঘুমের যাদুতেই সব-কিছু শেষ করতে পারে না, তাই—হয় ভালবাসে, না-হয় হিংসা করে, হয় কর্ণ হয়ে নিয়তির দাস সেজে বসে, নয় শকুনি হয়ে কু-পরামর্শ দেয় স্টেজে উঠে।

রুচিরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, নীরবে শুনে যায়, তার মুখের

ভাবান্তর লক্ষ্য করে আমি ভেতরে শিউরে উঠি; এ শিহরণ ভয়ের, না পুলকের—বুঝতে পারি না।

সেদিন বেড়ানো এই পর্যন্ত। অথচ এই দিনের পর থেকেই দেখলাম শিবেনের কেন জানি না ধারণা হলো যে সে আমাকে ছাড়া ভালোই চালাতে পারবে। বরং আমি তাকে গ্রাস করে রেখেছি বলে সে আরো বড় হতে পারছে না। রাহুমুক্ত না হলে সূর্য-চন্দ্রের জ্যোতি খোলে না। তা ছাড়া রুচিরা সম্পর্কেও তার কেমন ধরনের দুর্বলতা দেখা গেল। সে যেন অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েছে। মনে মনে কিসের একটা কষ্টে সে পীড়িত হচ্ছে! আমার মতো সে-ও কি তবে হিংসা করছে নাকি আমাকে? সে আমাকে ছাড়তে চায়। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারলাম না। মুনি-মূষিক কথার নীতি এখানে প্রযোজ্য নয়, তবু আমার ধারণা সে যেন আমার রচনা, আমি ছাড়া সে-কথা আর বিশেষ কেউ জানে না। তাই শিবেন আমার সম্পর্কে সাবধান হতে চায়। এই-ই হয়!

শিবেন আমাকে সে কথা স্পষ্ট করে বললে না, বলার সাহস বোধ হয় ওর নেই। তবু ঈষৎ উষ্মার সংগে বললে—মুকুন্দ, প্লিজ, আমি নিজেকে একবার যাচাই করতে চাই, তুই বাধা দিস নি; আমাকে ছেড়ে দে।

আমি লঘু সুরে বললাম—ছেড়ে দে কিরে, কি হয়েছে তোর, আমাকে খুলে বল সব। কিছু গোপন করিস নি।

শিবেন আমার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে—বললে, আমাকে সুখে থাকতে দে, মুকুন্দ! তুই বিজ্ঞ, তোকে আমি গুছিয়ে সব বলতে পারবো না। মুকুন্দ, প্লিজ।

সেদিন এই পর্যন্ত!

এর মধ্যে একদিন রুচিরার লেখা ছোট্ট একটি চিঠি পেলাম। মেয়ের লেখা চিঠি সেই আমার প্রথম পাওয়া। তাকে চিঠি না বলে চিরকুটও বলতে পারিস। ছোট্ট সাদা কাগজের এক টুকরোতে লেখা।

লেখার ছাঁদটি বড় মিষ্টি, কিছুটা আর্টিস্টিক। রুচিরা লিখেছে—তার নরম হাতের কোমল স্পর্শের স্নিগ্ধ ছাঁদে লেখা—জানি না তোমাকে কি বলে সম্বোধন করবো, আজ বুঝতে পেরেছি, তুমি শিবেনেরই একটি অংশ। আমি ত' শুধু শিবেনের স্ত্রী নই, মন বা মননের দিক থেকে তোমারও। গোড়াতে বুঝতে পারতাম না শিবেনের কথা শুনে, বাইরে যে এমন চৌখস, ভেতরে সে এমন বোকা কি করে? মাঝে মাঝে দুএকটা উজ্জ্বল কথার পাশেই এমন নিস্তেজ নিষ্প্রাণতা কেন! এখন বুঝেছি। শিবেনের আড়ালকে এখন ধরতে পেরেছি। সে কেন নীরবে তোমার ধমক সহ্য করে, তোমার অভিরুচি মেনে চলে—এখন আর আমার কাছে সে ব্যাপার এতটুকু অস্পষ্ট নেই। আমার স্বামীর মধ্যে তোমারও অদৃশ্য অবস্থান রয়েছে। আমি তা লক্ষ্য করেছি! তাই শিবেনকে স্বামী বলে স্বীকার করতে গেলে তোমাকে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করলে ত' চলে না! তা বলে তুমি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে শিবেনের মারফত আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে—এ আমি কখনো হতে দেব না। মাঝে মাঝে তোমারও সংগ চাই। তোমার সংগে দুটো কথা বলতে চাই, একটু মনের আবহাওয়ারও ত' বদল দরকার। তুমি জ্ঞানী লোক, আশা করি আমার মনের···বুঝবে। ইতি রুচিরা! মনের শব্দটার পর যে কী একটা শব্দ লিখেছিল, তা বুঝতে পারলাম না। খুব সুন্দর করে গোল গোল রেখা টেনে সেটি কেটে দিয়েছে। অনেক নাড়া চাড়া করে দেখেছি, অনেক রকমে পরীক্ষা করেছি—তবু শব্দটা যে কি বুঝতে পারিনি। গোড়ার অক্ষর কতকটা আকারের মতো বলে মনে হয়। তাহলে আকাংক্ষা বা আকুলতা হতে পারে। কিন্তু বোধ হয় শব্দটা এত নিরীহ নয়।

আমার জীবনে বুঝলি ঘন্টু, এই আমার পরম পাওয়া। বঞ্চিত মানুষের জীবনে এক কণাও যে অজস্রতার আশীর্বাদ বহন করে আনে। অমৃত আস্বাদ যার কল্পনাতীত, তার কাছে এ যে অভাবনীয় সম্পত্তি। চিঠির ভাষায় কোথাও সমর্পণ নেই। আমি অনেকবার পড়লাম, দেখলাম, কোথাও যেমন সমর্পণ নেই, তেমনি

কোথাও অনস্বীকারও নেই। এই অস্বীকৃতিই আমার পক্ষে অক্ষয় অমৃতস্বাদ !

ফল্টু, তুই হয়তো মনে করছিস—মুকুন্দটা পাগল হয়ে গেছে। ওরে, এই অমৃত যন্ত্রণা ভোগের আর এক নাম পাগল হওয়া। চিরদিন মানুষ এই রকম পাগল হয়ে এসেছে !

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম।

মেয়েলি হাতের অক্ষরে লেখা চিঠি, সাদা প্যাডের কাগজ, নীল্‌চে কালি—সব মিলিয়ে স্বর্গের কোন্ এক প্রীতিলোকের সান্ত্বনা বহন করে এনেছে। চিঠিটা একবার পড়লাম, দু'বার পড়লাম। আবার পড়লাম। আমার পাগলামিতে হয়তো তুই হাসবি। আমি চিঠিটার সর্বাংগে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কল্পনায় অনুমানে আনন্দনিকেতনের খবর নিতাম! সেই চিঠিটা পড়ে পড়ে আমার মুখস্থ হয়ে গেল! এ কি লিখেছে রুচিরা? না, আমাকে নাচাচ্ছে, মেয়েরা যাকে না চায়, তাকে নাচায়—এ খবর আমার অজানা নয়। তবু আবার চিঠিটা পড়লাম। শিবেন বুদ্ধির দিক থেকে একটু অচল, অন্তত রুচিরার মননে। রুচিরা সেই অভাবের ঘাটতি পূরণ করতে চায় আমার সংগে আলাপ করে। এ রুচিরা কী বলছে, দাবি সে তুলেছে যে যুক্তিতে—তা যে অস্বীকার করবার নয়। শিবেনকে স্বামী বলতে গিয়ে আমার কথা রুচিরার স্মরণে জাগে? কী যা-তা লিখেছে রুচিরা?

রুচিরা আমারও স্ত্রী? নয় কেন? উল্টো দিক থেকে দেখলে ত' তাই বটে। কি রকম যেন ছটফট করার রোগে ধরলো আমাকে। ফল্টু, তোর বোধ হয় মনে আছে—ফুলটুসি সম্পর্কে যখন তোর জিজ্ঞাসা-চঞ্চল মন ব্যাকুল হতো—আমি তোকে বলতাম—ফল্টু, গরীবের ঘোড়ারোগ ভালো নয়। তুই ঘোড়ারোগের অর্থ জানতে চাইলি। আমি তোকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম যে প্রেমেরই

'কোড'নাম দিয়েছি ঘোড়ারোগ। রেস যেমন ধনীকে ধ্বংস করে, তেমনই দরিদ্রকে ধ্বংস করতে প্রেমেরও ওই একই ভূমিকা।

আমার বুঝি ওই ঘোড়ারোগই ধরলো শেষে। রুচিরা একটু একটু করে কাছে এল। আমি তা চাইনি। দূর থেকে রুচিরার সৌন্দর্যসুধার পিয়াসী ছিলাম; কাছে সে এলে উত্তাপ লাগবে, আমি সে-আঁচে ঝলসে যেতে পারি! আমি এই ভয় করতাম। একদিন আমি বললাম—রুচিরা, তুমি আমার বন্ধুপত্নী, এর বেশী আর তোমার সংগে আমার পরিচয় নেই। অন্তত বাহ্যিক, অন্তত অফিসিয়াল। তাই তোমাকে অনুরোধ করতে আমার দ্বিধা নেই যে—তুমি যখন আমার এখানে আসবে—অন্তত শিবেনকে সংগে নিয়ে এসো, নিদেনপক্ষে ওকে বলে এসো।

রুচিরা তার মানে জিজ্ঞাসা করলো। এমনভাবে তাকালে আমার দিকে—যাক্‌গে সে-কথা। আমি বললাম—দোহাই তোমার, তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও, আমিও আমার কথা প্রত্যাহার করছি।

রুচিরা বললে—তোমার আর ওর মধ্যে তফাৎ কোথায়? তোমার কণ্ঠ, তোমার আচার ব্যবহার, জীবনদর্শন—সব কিছুই ত' ওর মধ্যে পাচ্ছি। আচ্ছা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো?

বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। রুচিরার আবার কি প্রশ্ন? শিবেন-সংক্রান্ত কোন কথা—না আমার দুর্বলতার খবর রুচিরা জেনেছে বলেই তিরস্কারমূলক কোন জিজ্ঞাসা? ভয়ে ভয়ে বললাম—বলো!

রুচিরা চোখ-দুটো মাটির দিকে নামিয়ে নিয়ে বললে—বুঝতে পারছি না, প্রশ্নটা করা এখন ঠিক হবে কিনা!

বেঠিকের কি আছে? মরিয়া হয়ে আমি জানালাম।

এখনই বোধ হয় এ প্রশ্ন সমীচীন নয়, কিন্তু তবু ক'দিন থেকে আমার মনটা বড্ড চঞ্চল হয়েছে জানার জন্যে—

শুধু যে বুকের স্পন্দন বাড়লো, তা নয়। রুচিরার কথা শুনে মাথাটাও যেন ঘুরে উঠলো! আমি শুধু বললাম—তুমি বলো—কী জানতে চাও?

রুচিরা মিষ্টি একটু হাসির ভান করে বললে—প্রশ্নটা অশোভন হলে দোষ নিয়ো না। আচ্ছা, তোমার এই যে চেহারা—একি জন্মাবধি এই রকম ?

কি জানি কেন, আমি এই প্রশ্নে বেশ আহত হলাম। আমার চেহারা বিশ্রী আমি জানি, এ নিয়ে ছোট-বয়স থেকেই অনেকের টিটকিরি, মস্করা শুনেছি। কোনোদিন সে সব মন্তব্যের প্রতি কান দিইনি। আজ কিন্তু রুচিরার কাছে এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে রীতিমতো ব্যথিত হলাম।

রুচিরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে তার প্রশ্ন আমাকে কষ্ট দিয়েছে, সেও করুণ স্বরে বললে—আমি তোমাকে আঘাত করার জন্যে জিজ্ঞাসা করিনি ; আজকাল বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছু কাজ নেই। যদি বাবাকে ধরে-করে তোমার একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করানো যায়—তাই এই জিজ্ঞাসা। ভারতবর্ষে না হয়—বিদেশেও ত' পাঠান যেতে পারে।

রুচিরার চোখ-মুখে সত্যিই করুণার প্রকাশ দেখতে পেলাম। আজীবন আমি মানুষের দয়া কুড়িয়েছি এ চেহারার জন্যে, রুচিরাই বা কেন মমতা দেখাবে না ?

আমার মনটাও কেমন দ্রবীভূত হলো। রুচিরার প্রতি অভিমান করা চলে না। দয়ার ঝুলি আমার চেহারায় আঁটা রয়েছে, কেউ যদি করুণা উজাড় করে দেয়—আমার প্রতিবাদ করা সাজে না।

আমি শুধু একবার একটু ভিজে-গলায় রুচিরাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুমি আমার কে রুচিরা, যে, এমন করে আমার জন্যে ভাবো ? রুচিরা বললে—আজ এর কোনো জবাব দেব না, একদিন বুঝতে পারবে !

কিন্তু সেই একদিন বুঝি আর আসে না !

রুচিরা আবার একদিন আমার ডেরায় এসে হাজির। কোনো ভূমিকা না করে সে সরাসরি বললে—একটা ফাঁপা মানুষের সঙ্গে ঘরবাস করা যায়—তুমি বলো ত' ?

শিবেন অন্তরহীন একটা প্রেত—কথাটা শুনতেও আমার ভালো লাগলো। নারী পুরুষের মনকে কত ছোট করে দিতে পারে! ঈর্ষা-সুন্দরী কী সুকৌশলে আমার মনে তার রাজ্য বিস্তার করে বসেছে! রুচিরাকে উদ্দেশ করে মনে মনে বললাম—রুচিরা, তোমার নাম ঈর্ষার কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে কেন রাখা হয়নি!

রুচিরা বললে—সাধারণ একটা কাজও সে নিজের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অনুসারে করতে পারে না, সব সময়ই তোমার পরামর্শ দরকার হয়। এই ক'টা বছর ধরে আমার শুধু তাই মনে হয়েছে—আমি যেন তার স্ত্রী নই, তোমার বউ। আমাদের দুজনের মধ্যে তোমার অমোঘ স্থান। তুমি কি বলো?

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শয্যা ছেড়ে উঠে যে আলোর বোতামটা টিপে দেব—সে ইচ্ছা হলো না। সন্ধ্যার সেই ম্লান অন্ধকারে রুচিরার মুখটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। এক এক বার কল্পনা করছিলাম—রুচিরা বোধ হয় করুণ বোধ করছে; আবার ভাবলাম—তাই বা কেন? শিবেনের পথ থেকে আমাকে সে সরাতে এসেছে। শিবেনের ভূত তাড়াতে এসেছে। সে করুণ হতে যাবে কেন, বরং কিছুটা দৃঢ়, কিছুটা শক্তই হয়েছে সে।

আমি বললাম—রুচিরা, আমার একটা কাজ করে দেবে? একটু উপকার?

রুচিরার রূপমূর্তি যেন বদলে গেল। চোখ-মুখে রাগের চিহ্ন পর্যন্ত ডুবে গেল।

খুব নরম স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বললে—কী কাজ? বলো।

আলোর বোতামটা টিপে দেবে একবার—এই-যে সুইচ্ বোর্ড, একেবারে নীচে ,বাঁ-দিকের বোতামটা। অন্ধকারের এই ছায়া দেখতে আমার ভয় করছে। তাই অনুরোধ করছি—যদি এই উপকারটুকু করো—

ও—এই, বলে তাচ্ছিল্যের সংগে রুচিরা উঠে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলে।

আমি বললাম—ভাবলাম তুমি যখন এসেছো, তখন আর আলোর দরকার কী। তোমার দীপ্তিই ত' এখানের অন্ধকার দূর করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ছায়াকে আমি বড় ভয় করি—তাই।

—ও। একটু কঠিন হয়ে উঠলো রুচিরার মুখ। সে বললে—ছায়া সৃষ্টি করে অন্যকে বিহ্বল করাই বুঝি তোমার কাজ?

না, না—এ তুমি কী বলছো রুচিরা? ছায়া যে অন্ধকারে লুকোতেই চায়। আমার বিকৃত দেহ নিয়ে আমি যে আড়ালেই থাকতে চেয়েছি। কখনো প্রকাশ্যে দেখা দিইনি। নেপথ্য থেকে যদি প্রেমটারের গলা শোনা যায় মাঝে মাঝে—তাতে সূত্রধারের অপরাধ যতটা ঠিক, ততটা অভিনেতার অপটুতা।

রুচিরা আমার কথা শোনে—আর মনে হয়, মুগ্ধ হয়ে ওঠে। এমন সময় শিবেন এল। একটু রাগত ভাবেই রুচিরাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এখানে কি করছো?

শিবেনের এই প্রশ্নের মধ্যে বোধ হয় একটু রূঢ় এবং অভদ্র ইংগিত ছিল। কেননা প্রশ্নটা রুচিরাকে সে করলেও—কঠোরভাবে আমার দিকে তাকালে। এই বোধ হয় প্রথম শিবেন এমন রূঢ়ভাবে আমার দিকে তাকালে।

রুচিরা খুব সাধারণভাবে জবাব দিলে, কেন—তোমার মনের সংগে বসে দুটো কথা বলছি।

অর্থাৎ? শিবেন রুষ্ট হয়ে উঠলো।

আমি বললাম—রাগিসনি, শিবেন। চোখ রাঙানো তোর শোভা পায় না।

রুচিরাকে আমি শাসন করবো—তাতে অন্যের কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।—শিবেন যেন গর্জন করে উঠলো।

অন্যের কথা তোকে শুনতেও হবে না, শিবেন। আমি এমন কেউ অন্য নই। আমি বারণ করছি—কোনো নারীকে কখনো চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে নেই, ওটা শোভনতার বাইরে।

শিবেন খুব সামলে নিলে। সেদিনও সে আমাকে অমর্যাদা দেখাতে

পারেনি। মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো সে শান্ত হয়ে গেল। রুচিরা ঠিক সেই সময় খিলখিল করে হেসে—চপলভাবে বেণী দুলিয়ে চলে গেল। যেন একটি পঞ্চদশী কিশোরী কন্যা। তার চলে-যাওয়ার ছন্দটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে। গতিভংগ নিয়ে লেখা অনেক কবির কাব্য পড়েছি, কিন্তু ও-জিনিসটি যে কিরকম অভিরাম, সেটি সেদিন বুঝলাম।

শিবেন বললে—দিস্ ইজ্ এনাফ্। যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে তুই মুক্তি দে, মুকুন্দ। দেখছিস না—রুচিরা ধীরে ধীরে আমার হাতের মুঠো খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ছে।

তোর কব্জির জোর কমে আসছে বল্। আমি বললাম।

না, ঠাট্টা নয়। রুচিরা তোর সম্পর্কে আজকাল কি রকম আগ্রহশীল হয়েছে জানিস?

না।

থাক, সে আর তোর জেনে কাজ নেই।

কেন, তোর হিংসে হয়? এই পংগু বিকৃতদর্শন তোর বন্ধুর ওপর দয়া না হয়ে ঈর্ষা হয়? তুইও শেষে আমাকে হিংসে করছিস—শিবেন?

একটু থেমে আমি বলতে লাগলাম—তাকা—আমার মুখের দিকে। বল—এবার তুই কি সত্যিই আমাকে হিংসে করিস?

বোধ হয় শিবেন লজ্জিত হয়ে থাকবে। তারপর কিছুদিন সে আর আমার ছায়া মাড়ায়নি।

রুচিরা বরং বেশীই আসতো। এ-কথা সে-কথা হতো। নিজের হাতে হয়তো একটু সরবত তৈরি করে দিতো, কিম্বা মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতো। আমি জানতাম আমার প্রতি একটু করুণা ওর জেগেছে। বুদ্ধি, বিবেচনা, স্নেহ-প্রীতি, শুভ্রবোধ, জীবনের পরিচ্ছন্ন রুচি—একটি নারীর মানসিক আকাংক্ষা-রাজ্যের যা-কিছু সরঞ্জাম—তা ত' সবই আমার মনে রয়েছে। তবু আমি রিক্তসর্বস্ব, এই রকম একটা করুণা রুচিরাকে পেয়ে বসতে পারে।

মেয়েরা যে সব সময় রূপবান পুরুষের জন্যেই উন্মত্ত হয়, এমন নয়।

মনের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা, শুচিশুভ্রতাও তাদের কামনা এবং সাধনার ধন। এটা যেন পুরুষরা কখনো ভুলে না যায়।

আমি আকাশ দেখতাম। দিল্লীর আকাশ কী উদার, উন্মুক্ত, নীল, নির্মেঘ। কিছু হয়তো বলতাম না। রুচিরাই প্রশ্ন করতো—কি ভাবছো? আজ যে বড় গম্ভীর।

দেখছিলাম দিল্লীর আকাশের চেহারা! এমন গাঢ় নীল আকাশ দেখলে সত্যিই মনটা ভাবুক হয়ে ওঠে!

ভাবুক মনের কিছু পরিচয় ত' কাগজে কলমে রেখে গেলেই পারো!—রুচিরা বললে।

না, হ্যাঁ, তা লিখলেই হয়। বাঙালী-মাত্রেই কবি। কেউ গুছিয়ে লিখতে পারেন, আর কেউ অগোছালো থাকেন সারাজীবন! এই অগোছালো মানুষ যে প্রকাশ-মুখর কবির চেয়ে কম অনুভূতিশীল—তা ভেবো না। তাঁদের ক্ষমতা নেই—ফুটিয়ে তোলার। তাঁরা নিজেরা ভাবেন, ভাবাতে পারেন না।

তাই নাকি? ঠোঁট উল্টে রুচিরা জিজ্ঞাসা করলে।

হ্যাঁ, সূর্যের আলো ত' পৃথিবীতে সর্বত্র বিকীর্ণ হয়, সব জায়গার মাটিতে ফুল ফুটিয়ে তুলতে পারে না! মানুষও তাই, কাব্যের দীপ্তি সব মনেই চমক হানে, কিন্তু আলো ফুটিয়ে তুলতে পারে ক'জন?

তুমি চেষ্টা করলে যে পারতে না—তা মনে হয় না!

বোধ হয় পারতাম, বোধ হয় বা পারতামও না। কি জানি! যে কাজ পারবো বলে গর্ব নিয়ে আসরে নেমেছিলাম—সে-কাজই ভেস্তে যেতে বসেছে! যার জন্যে অধ্যবসায় ব্যয় করলাম—তাতেই সাফল্য এল না। মনের যত বাসনা, তত কিন্তু ফসল নয়। মুকুল যত—তত কি ফল হয়?

তোমার মনে কোথায় একটা বেদনার কাঁটা ফুটে আছে—মনে হয়, জানলে আমি সে-কাঁটাটা মুক্ত করে দিতে পারি।

এইটুকুই আমার পাওনা, রুচিরা—তার বেশী নয়, একটু সহানুভূতি, একটু প্রীতিকণা—ব্যস্, তাতেই আমি খুশী।

না, না—এ তুমি কি বলছো! তোমার যে আরো কিছু বেশী পাওনা।

রুচিরা! শিবেন আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তুমি তার স্ত্রী। বন্ধুপত্নী বলেই তোমাকে জানি, তোমার কাছে তার চেয়ে বেশী কিছু চাইওনা।

রুচিরা কাছে সরে এল একটু, বোধ হয় একটু হেসে থাকবে, তারপর বেশ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে জানালে,—আমি জানি কতটুকু তোমার পাওনা আর কতটুকু নয়! মনের দিক থেকে কি আমি তোমার সম্পত্তি নই? তুমি অস্বীকার করতে পারো?

অস্বীকার আমি নিজের মনের কাছে করিনি। কিন্তু কি করে সে-কথা রুচিরাকে জানাই। আমিই বরং সরে গেলাম সে-দৃশ্য থেকে। রুচিরার সম্বিৎ হারিয়ে গেল নাকি?

ইতিমধ্যে রুচিরা আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভ্যাসের সংগে পরিচিত হয়েছে কিছুটা। রুচিরা রোজ ঘর গুছিয়ে দিয়ে যায়, খাবার ঘন্টাখানেক পরে যে জল খাই একগ্লাস, সেই জলটুকু ঢাকা দিয়ে মাথার কাছে রেখে যায়। করুণা করেই করে, ধরে নিতে দোষ কি! স্বামীর পংগু এক বন্ধুকে যদি সেবাই করে রুচিরা—

এভাবে কিন্তু মন ভাবতে চায় না! রুচিরা একটু একটু করে কাছে আসছে, মমতার রাস্তা ধরে, আলাপের মাধ্যমে নিজের দুর্বল হৃদয়ের একটা সহজ আবেগকে যেন প্রকট করে দিতে চাইছে!

আর এই বিষয়টা আমাকেও নাড়া দিতে লাগলো খুব বেশী। আমার মানসিক সম্পদ উপভোগ করছে শিবেন—কিন্তু তার জন্যে কোনো মাশুল ত' সে দিচ্ছে না! রুচিরা ঠিকই বলেছে—মেয়েরা মনের ফসলকেও তাদের হৃদয়ের ভাঁড়ারে সঞ্চয় করে রাখে। সেদিক থেকে আমি ত' নিঃস্ব নই। তাহলে?

শিবেনকে যেজন্যে আমার ঈপ্সিত মানুষ বলে আমি ধরেছিলাম—তাকে সেভাবে পেলাম না। প্রতিমুহূর্তে ছায়ার মতো ওর পেছনে না থাকলেই ও ওলোটপালোট করে দেয় সব কিছু। কথাবার্তা বিশ্রীরকম

বলে ফেলে। বিশ্ববিশ্রুত ও কোনোদিনই হতে পারবে না। এমন কি ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাও না। বুদ্ধির দিক থেকে এমন অপদার্থ ছেলে আমি আর দেখিনি।

শিবেন আমার ওপর বীতরাগ হয়ে উঠেছে। রুচিরাই বোধ হয় কারণ। ওর মনে একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। রুচিরা ওকে তাতায়, ওকে মাতায় কিন্তু কথা ব'লে শিবেনের অন্তরকে প্রশান্ত করার চেষ্টা করে না। আমার সংগে যখন রুচিরা ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা মারে, তখন রুচিরা যেমন মুখর হয়, যেমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে, শিবেনের সংগে তেমন ত' হয় না। নিতান্ত কাজের কথা সংক্ষেপে সেরে নেয় দুজন। শিবেনের রাগের যে কোনো কারণ নেই—এমন কথা বলতে পারি না।

শিবেনও রুচিরাকে নিয়ে কোলকাতায় ফিরে যাবার চেষ্টা করছে। রুচিরার সংগে তার রোজই কলহ বাধছে, ঝগড়া হচ্ছে। সে খবর আমি রাখি। উভয়পক্ষ থেকে আমার নাম ওঠে, তীক্ষ্ণ তীর ছোঁড়া হয় আমার দিকে—তাও উপলব্ধি করি। কিন্তু কোথায় যেন আটকা পড়েছি। শিবেনের খোলস থেকে নিজের মনকে তুলে আনতেও পারছি না, রুচিরাকেও সান্ত্বনা দিতে পারছি না। সাপের পক্ষে ছুঁচো গিললে যেমন অবস্থা হয় —এ যেন কতকটা সেই দশা।

একদিন রুচিরা এসে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি আজকাল এত কী ভাবো বলো ত'? রাতদিন গম্ভীর হয়ে বসে কী চিন্তা করো?

আমি অপকটে স্বীকার করলাম—আমি বোধ হয় অজ্ঞাতে শিবেনের অধিকারে প্রলুব্ধ হাত বাড়িয়ে ফেলেছি। সেই ধিক্কার আমাকে তীক্ষ্ণ শেলের মতো হানছে।

না—না, তোমার কোনো দোষ নেই,—রুচিরা কতকটা সহজ হয়েই বলতে লাগলো—আমি তোমাদের উভয়কে আবিষ্কার করে, আমিই এগিয়ে এসেছি। তুমি কি মনে কর—মেয়েরা শুধু পুরুষের দেহ গৌরবকেই আঁকড়ে ধরতে চায়? মেয়েদের মন বলে কোন পদার্থ নেই? তাদের মনের খাদ্য বলে পৃথিবীতে বুঝি কোন সম্পদ নেই?

আমি এর কী জবাব দেব? শুধু নির্বাক বিস্ময়ে রুচিরার সুন্দর তনু মহিমার দিকে তাকিয়ে থাকলাম!

মেয়েদের মন আছে—এ আমি স্বীকার করি, ফল্টু। সেই মনের দিক থেকে তারা রিক্ত হতে চায় না, তাও জানি। প্রেম শুধু দেহকেন্দ্রিক পরিণতির মূঢ়তা থেকে ওপরে উঠতে জানে। মন দিয়ে মন হাতড়ানোর ব্যাপারটাও প্রেমের একটা বড় অভিব্যক্তি।

এই ভাবে কিছুদিন কাটলো।

একদিন শুনি শিবেন দিল্লী থেকে রুচিরাকে নিয়ে চলে গেছে কোলকাতায়। ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে এসে উঠেছে। খবরটা শুনে খুশী হলাম, আবার দুঃখও পেলাম।

আমি ভাবতে বসলাম। শিবেনের মধ্যে দিয়ে যে সার্থকতার স্বপ্ন দেখেছি—তা শুধু মিথ্যে নয়। তার অবাস্তবতা বিদ্রূপ করে আমাকেই তীব্র কশাঘাত করেছে। শিবেন আমার আশানুযায়ী বিখ্যাত হতে পারবে না। যদি অর্থার্জনেই মন দিতাম, আইন-ব্যবসায়ের মাধ্যমে আমি প্রচণ্ড ধনী হতে পারতাম। তা হইনি। যদি লোককল্যাণের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতাম—তাহলে তার সার্থকতা বা ব্যর্থতা এমন করে আমাকে পীড়িত করতো না। নিজের জীবনটা চুরমার করে আছড়ে ভেঙেছি। শিবেনকেও সুখী করতে পারিনি। আমড়া-গাছের ডালে আমের চারা যুক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছি। শিবেনের জীবনটাও নষ্ট করেছি। সাধারণ খেলোয়াড়ের অতিসাধারণ জীবন নিয়েই হয়তো সে সন্তুষ্ট হতো, সাধারণ মোটাবুদ্ধি মানুষের মতো যে-কোনো অফিসে একটা কেরানীগিরি জুটিয়ে নিয়ে দশটা-পাঁচটা করতে পারতো, তাতে সে খুশীই হতো। কে জানে—হয়তো ফুলটুসি মানে খেলাকেই বিয়ে করে দু-চারটে কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করার সাধারণ মানবিক দায়িত্ব পালন করে গর্ববোধ করতো। আমি তাকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে বৃহত্তর, বিরাটতর এক জীবনের হাতছানি সম্মোহনে ভুলিয়েছি। সে তাল রাখতে পারেনি। ঝোলান সরু তারের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে

বাহাত্বর বলে প্রশংসা জোটে বটে, কিন্তু হাঁটতে গেলে পায়ের ব্যালান্স দরকার হয়। কৌশল শিখিয়ে দিয়েছি শিবেনকে, কিছু দূর হেঁটে দেখিয়েও দিয়েছি—নেপথ্যে থেকে যতদূর হাঁটা সম্ভব ; কিন্তু একটুখানি পথও অন্তত লোকচক্ষুর সামনে হাঁটতে হবে। নইলে বাহাত্বর বলবে কেন ? শিবেন সেখানে অপারগ হয়েছে। বড় জীবনের আদর্শ-দোলায় চাপতে গিয়েছিল সে—সেখান থেকে তাকে পড়তে হবে নীচে, অনেক নীচে। এ আঘাত সহ্য করবে সে কি করে ? শুধু তার নিজের নয়, তার স্ত্রীর জীবনকেও আমি নষ্ট করেছি।

রুচিরার জীবন। হ্যাঁ—রুচিরার জীবনও আমি নষ্ট করেছি। রুচিরার মনের জীবন—সেখানে রক্তপলাশের ছোপ ধরেছে, কথার মোহে নেশার আবিলতা জমেছে। সে শিবেনের মুখের ওপর তর্ক তুলতে শিখলো। চোখের ওপর আমি তা দেখেছি।

শুনেছি কোলকাতাতেই নাকি একদিন শিবেন রুচিরাকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করেছিল। কি নিয়ে কি কথা কাটাকাটি হয়—তারপর রুচিরা যখন আমার কথা তোলে—তখন শিবেনের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে রুচিরাকে শুধু তিরস্কার করেনি, মেরেছে পর্যন্ত।

কয়েকদিন পরে আমি এ খবরটা পেলাম, রুচিরার ছোট্ট একটি চিঠিতে। সে আমাকে লিখেছে যে, সে চলে যাচ্ছে। শিবেনের হাত থেকে সে বাঁচতে চায়। এ বিষয়ে আমার প্রতি তার একটা আনুগত্য আছে। সে স্পষ্টই লিখেছে—আমি শুধু শিবেনের স্ত্রী নই, নীতির দিক থেকে কিনা জানি না, জীবনের দিক থেকে—তোমারও স্ত্রী। যদি আমার স্বামীর গুণ্ডার অংশ থেকে আমার স্বামীর ভব্য অংশ রক্ষা করতে না পারে—তবে আমার ভবিষ্যৎ কর্মে তোমাদের কোনো মন্তব্য তখন আমার প্রাপ্য হবে না। মুকুন্দ, আমাকে তুমি বাঁচাও। তোমার পংগুত্বের ভুয়ো অজুহাত নিয়ে তোমার স্ত্রী একজন লম্পটের হাতে ধর্ষিত হোক—এ তোমার সহ্য করা উচিত নয়। বিশেষ করে কোনো পুরুষের পক্ষেই এটা গৌরবের বিষয় নয়।

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষেপে তোকে জানাচ্ছি।

আমি কোলকাতায় ফিরতে বাধ্য হলাম। এতদিন আমার ধারণা ছিল যে আমি শুধু নিজেকে আর শিবেনকে নষ্ট করেছি। কিন্তু দেখছি রুচিরার জীবনও জড়িয়ে গেছে আমাদের বিনাশের সংগে। আমাদের বিষ-নিশ্বাসে তার সৌন্দর্যেও অভিশাপের হাওয়া লেগেছে।

শিবেনের বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেলাম। সে রুদ্রকণ্ঠে আমাকে হাঁকিয়ে দিয়ে বললে—গেট্ আউট্, রাস্কেল। রুচিরাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস—বের করে দে—নইলে আমি তোকে খুন করে ফেলবো।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শিবেন আমায় তার বাড়ী থেকে দূর করে দিতে চায়? সেই শিবেন—যাকে আমি তিল তিল বুদ্ধি দিয়ে, মনুষ্যত্ব দিয়ে, বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ দিয়ে—রচনা করেছি? কি বলছে সে? —তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

কি বলছিস তুই, শিবেন?

আর তুই আমাকে ঠকাতে পারবি না, মুকুন্দ। এতদিন আমাকে বোকা বানিয়েছিলি বটে, এবার আমি সতর্ক হয়েছি। রাস্কেল—

আমি তখনও রুষ্ট হয়নি।

শিবেন বললে—রুচিরাকে ভাগিয়ে নিয়ে কোথায় রেখেছিস বল্?

রুচিরা? সে নেই এখানে? আমি ত' তার চিঠি পরশু পেয়েছি। পেয়েই রওনা হয়ে এই আসছি কোলকাতায়।

এই আসছি কোলকাতায়!—আমার কণ্ঠস্বরকে বিকৃত করে পুনর্বার উচ্চারণ করলে শিবেন।

আমি ক্রুদ্ধ হলাম।

সে বললে—সাধু পুরুষ, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। সিংকিং সিংকিং সবই চলে—

ঠাস করে শিবেনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম।

আশ্চর্য, শিবেনের অত লাফালাফি ওই এক চড়েই ঠাণ্ডা হয়ে এল।

সে আত্মসমর্পণ করার ভংগীতে বললে—রুচিরা কোথায় চলে গেছে—পরশুদিন বিকেল বেলা।

কোথায় গেছে? দিল্লী?

না।

তবে? চুঁচড়ো?

না, সেখানেও দেখে এসেছি। সে যায়নি। সে তোর প্রত্যাশাতেই বোধ হয় ঘুরছিল। রোজ রোজ তোর নাম করতো, তাই একদিন দিলাম কষিয়ে—

কষিয়ে কিরে?—মারধর করতিস নাকি তুই?

শিবেনের নীরবতাই এ প্রশ্নের জবাব দিলে। শিবেন রুচিরাকে প্রহার করতো! এ কথা জেনে শিবেনের মুখ-দর্শন করার প্রবৃত্তি পর্যন্ত আমার চলে গেল।

কয়েকটা দিন এখানে সেখানে রুচিরার সন্ধান করলাম। কিন্তু কোথায় তাকে পাবো? দিল্লীতেও এলাম প্লেনে করে। এখানে এসে দেখি সে আমার কাছে একটি চিঠি দিয়েছে—ছোট্ট একটি চিঠি, কয়েক লাইন লেখা—তুমি একদা জানতে চেয়েছিলে—আমি তোমার কে? উত্তরটা আজ দিতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই। আমি তোমার কে জানো—আমি তোমার বউ। কিন্তু ডক্টর জেকিল তার বউকে মিস্টার হাইডের হাতে কি করে ছেড়ে নিশ্চিন্ত হলো? যদি কখনো হাইড-মুক্ত হও তুমি, খুঁজো। ইতি তোমারই রুচিরা।

আবার কোলকাতায় ফিরে এলাম।

তা' হলে একেবারে ব্যর্থ নই আমি? ···একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবার জন্যে কোনোরকম অধ্যবসায় ব্যয় করিনি বটে, কিন্তু সেই সৌভাগ্য স্বেচ্ছায় আমাকে মহান্ করে দিলে। ভারতবর্ষে শিবেনকে বিখ্যাত করতে পারলাম না, কিন্তু আমি যে অমৃত-সৌধের তোরণে গর্বের সংগে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়লাম! প্রেমের অমৃত-যন্ত্রণায় আমার দেহ-বিকৃতির সমস্ত বেদনা একমুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কিন্তু শিবেন আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। ওর ধারণা

রুচিরাকে আমিই লুকিয়ে রেখেছি। রুচিরার জন্যে শিবেন কিছুটা উন্মাদ হয়ে পড়েছে বুঝলাম। ওর চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে গেছে। জামা-কাপড়ে মলিনতা এসেছে। চলনে বলনে কেমনধারা অসংলগ্নতা।

কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছিস—আমি শিবেনকে খুন করেছি বলে রটনা। সেই খুনের সত্যতা কতদূর—তা আমি কাউকে বিশ্বাস করাতে চাইনে—শুধু সংক্ষেপে জানাই ঘটনাটি কী ঘটেছিল, তুই বুঝবি।

খুনী আসামী রূপে সমাজের চোখে যখন একবার ধরা পড়েছি, তখন সাফাই গাওয়ার মূল্য কী? তবু আমার ত' কিছু কথা থাকতে পারে।

ঘটনাচক্রকে আমি বড় বেশী বিশ্বাস করি, আইনেও circumstantial evidence বলে একটা জিনিষ আছে। আমাদের প্রবাদেও বলে যে দশচক্রে শ্রীভগবানও ভূতরূপে গণ্য হতে পারেন। আমার দশাও কতকটা সেই রকম। আসামী বলে কোর্টে আমার নির্দোষ ছাড়া আর কিছু বলার কোনো সুযোগ নেই, জবাব দিতে গিয়ে আমার পক্ষে যেসব কথা বলা দরকার—তা প্রাসংগিক হবে না। শুধু তোকে জানাচ্ছি—আমার কথা একেবারে অলিখিত বা অজ্ঞাত থেকে যাবে—একজনও জানবে না, এমন হওয়া উচিত নয়—শুধু এই ছেলেমানুষি-বোধ থেকেই তোকে লিখছি। অন্তত এবার আমার ব্যাপারে যে এক্সপার্টি ডিক্রী হচ্ছে না—সেই অনুভূতি নিয়ে মরতে পারবো।

ফল্টু, তুই এটুকু জেনে রাখ যে, আমি শিবেনকে খুন করিনি, ওকে আমি খুন করতে পারি না। অথচ ঘটনা-প্রবাহের কী বিচিত্র গতি! খুনী বলে আজ আইনের চোখে আমি দোষী হতে চলেছি।

হ্যাঁ;—যে কথা বলছিলাম। শিবেনের মাথার দোষ হলো। পথে ঘাটে সে বিড়বিড় করে যা-তা সব বকতে লাগলো। আমার নামেও যে কুৎসা রটনা করে বেড়ায় না—এমন কথা কে বলবে?

ল্যান্সডাউন রোডে ওদের বাড়ীতে ওকে একদিন দেখতে গেছি। কি-এক কথা নিয়ে বচসা বেধে গেল। রুচিরার কথা নিয়েই তর্ক উঠলো।

শিবেন এতদূর বিকৃত-চিত্ত হয়ে পড়েছিল যে সেই মেয়েটিকেও কুৎসার হাত থেকে রেহাই দিতে চায় না।

ইদানীং শিবেন কোথা থেকে একটা রিভলবার যোগাড় করেছে, সেটা সংগে নিয়ে সে সব সময় ঘুরতো। একবার এইরকম কি-একটা কথা কাটাকাটির পর রিভলবার উঁচিয়ে আমাকে গুলি করে হত্যা করতে উদ্যত হলো। আমি তৎক্ষণাৎ তার হাত চেপে ধরে তাকে সাবধান করতে গেলাম। কিন্তু সে আমার পংগু চেহারায় সজোরে পদাঘাত করলে —ঘৃণায়, রাগে তার মুখটা দেখলাম—হিংস্র পশুর মতো বীভৎস হয়ে উঠেছে। নির্বাক বেদনায় আমি শুধু একবার শিবেনের মুখের দিকে তাকালাম। সে রিভলবার তুলে আমার কাছে এল। আমি তার হাত থেকে রিভলবারটা ছিনিয়ে নিলাম। সে পশুর মতো গর্জন করে উঠলো।

আমি ধমক দিলাম; বললাম—কি হচ্ছে, শিবেন? নিজের পশু-বিক্রমকে জয় করেছে বলেই মানুষকে জন্তু বলা হয় না!

শিবেন ভেংচি কেটে বললে—থাক, আর নীতিকথা নয়। I shall teach you a good lesson রাস্কেল, তোকে আজ আমার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। রুচিরাকে কোথায় লুকিয়েছিস্—বল্। নইলে—নইলে—

হঠাৎ সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত থেকে রিভলবারটি কেড়ে নিলে!

তুই ঠাণ্ডা হ' শিবেন। নিজের মুখের চেহারাখানা ছাখ্—ওই আলমারির গায়ে-আঁটা আয়নায়। ছাখ, তোর মতো সুপুরুষের সুন্দর মুখটাও কত কদর্য হয়ে উঠেছে। কিম্বা মাটির দিকে তাকিয়ে থাক্ এক মিনিট—রাগ নেবে যাবে।

তুই চুপ করবি—না গুলি করে তোর মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেব—শিবেন বীভৎসভাবে চীৎকার করে উঠলো।

এত জোরে শিবেনের গলা চড়ে গিয়েছিল যে, ওর বাড়ীর চাকরটা পর্যন্ত ঘরে ঢুকে পড়লো। আমি তাকে ধমক দিয়ে বাইরে পাঠালাম—যা, বাইরে যা। এখানে কিজন্যে এসেছিস! চাকরটা চলে গেল।

শিবেনেরও বোধ হয় রাগ একটু পড়ে থাকবে, দেখলাম—তার দু'চোখে ছল ছল করছে! একটু আগে ক্রোধোন্মত্ততার রুদ্ররূপ, একমুহূর্তেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়বার মতো বেদনাবিহ্বল।

রুচিরাকে নিয়ে শিবেন ধাক্কা খেয়েছে, আমার জন্যে সে সুখী হতে পারছে না। আমি আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলাম—তুই আমার প্রতি বিশ্বাস রাখিস শিবেন, তোর জীবনকে বিষিয়ে দেব না! রুচিরা সম্পর্কে তুই এত চঞ্চল হলি কেন? আমার প্রতি রুচিরার করুণা হয়ত জেগেছে, কিন্তু তোকে সে সত্যিই ভালবাসে।

শিবেন কেঁদে ফেললে—একসংগে কত-কি যে বললে—তার সব বোঝা গেল না। তুই ত' জানিস—কত দ্রুত ও কথা বলতে পারে। আর একসংগে নানা কথাও বলে মাঝে মাঝে। যেসব কথা এখন শিবেন বললে—তা থেকে শুধু দুটি কথা বোঝা গেল যে, রুচিরা ওর বুদ্ধিহীনতার জন্যে তিরস্কার করেছে, তোতাপাখির মতো আমার কথা আউড়ে যাওয়ার মধ্যে কোন গৌরব নেই, সেটা বোঝা গেল, আর আমি শিবেনের চেয়ে শুধু চেহারা ছাড়া আর সব দিক থেকেই ভালো।

শিবেন বলতে লাগলো—রুচিরা আমাকে অপমান করেছে, আজকাল প্রায়ই করে। কথায় কথায় উঠতে-বসতে আমাকে আঘাত করে। পত্নীর চোখে হীন হয়ে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না, পংগু হয়েও তুই আমার কাছ থেকে ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছিস—এ দুঃখ আমার কখনো যাবে না!

শিবেনকে আমি কী স্তোক দেব? রুচিরার চোখে সে ছোট হয়ে গেছে। রুচিরা আজকাল তাকে অপমান করতে দ্বিধা করে না।

শিবেন কত কথা বলেই না দুঃখ করতে লাগলো। ইদানীং তার মাথায় বিশৃংখল চিন্তা বাসা বাঁধছিল। সুতরাং এখন তার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে গেলে যদি হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আমি ভাবলাম শিবেন শান্ত হয়ে আসছে—এই সময় যদি দু'কাপ চা কিম্বা কফির ব্যবস্থা করা যায়—মন্দ হয় না।

আমি ঘরের বাইরে বেরিয়েছি দরজা ঠেলে, এমন সময়

রিভলবার ছোড়ায় আওয়াজ পেলাম। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি—শিবেন আত্মহত্যা করেছে—বুকের ওপর তার রিভলবারটা রয়েছে—রক্তে ঘরের মেজে ভিজে গেছে, সে গড়াগড়ি খাচ্ছে, রিভলবারটি সরিয়ে আমি শিবেনকে কাৎ করে শুইয়ে দিলাম—সে ততক্ষণে নিঃসাড় হয়ে পড়েছে। শিবেন আর ইহলোকে নেই।

রিভলবার ছোড়ার শব্দ শুনে চাকরটিও এসেছিল—সে ঘরের ওই দৃশ্য দেখে ছুটে কোথায় পালালো জানি না, তাকে তখন ডেকেও আর সাড়া পাইনি।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। একটু পরে সম্বিৎ ফিরে এল। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ঘটনাচক্র আমাকেই খুনী প্রমাণ করবে, পুলিশও ছাড়বে না।

আমি সেখান থেকে দ্রুত চলে এলাম বাড়ীতে; বাড়ী থেকে একেবারে সোজা দিল্লীতে, সেই রাত্রেই।

দিল্লীতে এসে শুনি রুচিরা কোথায় চলে গেছে,—তাদের সংসারের অনুগৃহীত এক ভদ্রলোককে সংগে নিয়ে রুচিরা পালিয়েছে। নতুন জীবনের আস্বাদ তাকে পাগল করেছে। তাকে তাতিয়েছে, তাকে মাতিয়েছে।

ইতিমধ্যে পুলিশ আমাকে খোঁজ করছে। আমার যা দেহ-বিকৃতি —এ নিয়ে লুকিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই ধরা দিতে চাই। মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাই।

জীবন-নাট্যের যবনিকার আগে তোকে জানালাম কাহিনীটা। তুই শিবেনের এবং আমার জীবনের একটা অধ্যায়ের সংগে বেশ কিছুটা পরিচিত বলেই তোকে এই চিঠি লিখে গেলাম।

পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে বড় মায়া হয় রে!—এই সুন্দর সুশ্রী মায়াময় জগতের প্রতিও একটা ভালবাসা আছে আমাদের। যেমন ইদানীং রুচিরাকে ভালো লাগতো, ঠিক প্রিয়তমের মতোই এই পৃথিবীকে ভালো লাগছে। এর আকাশ-বাতাস, মাটি-জল, গ্রাম-নগর, নদী-নদ—সব-কিছুর জন্যেই মমতা জাগছে। তার ওপর আছে মানুষ। ব্যক্তিগত

কোনো মানুষ নয়—মরবার আগে সমগ্রভাবে মানুষকে ভালবাসতে পারছি। মানুষ নামেই যারা অভিহিত—তারা সকলেই যেন এক, সকলে মিলেই যেন তারা আমার একক রুচিরা। মানুষকে এমন করে মিষ্টি ত' এর আগে কখনো লাগেনি!

ফল্টু, মানুষ মারার অপরাধ আমাকে স্পর্শ করেনি, কিন্তু শিবেনের মৃত্যুর পরোক্ষ কারণও যদি আমি হই—তবু সেই ত্রুটি আমার—তোরা ক্ষমা করিস। আর একটা কথা। ফল্টু, তুই ত' জানিস, যে—কেউ কখনো আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি। যদি পারিস—আমার কথা একবার ভাবিস! রিক্ত, বঞ্চিতসর্বস্ব, পংগুদেহ একজন সুস্থচেতন মানুষের জন্যে কেউ কখনো কাঁদেনি রে! সে জন্মেছিল লোক-কল্যাণের ব্রত নিয়ে, কিন্তু মরেছে পাপের বিভীষিকাময় পংকিল আবর্তে ডুবে। তুই আমার প্রতি হয়তো অনুগৃহীত, তাই যে তোকে আমার জন্যে এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে বলছি—তা মনে করিসনি। মানুষের মমতা নিয়ে দরদ নিয়ে আমাকে বিচার করিস। Some pious drops the closing eye requires!

আজ সন্ধ্যার সময় তোদের মুকুন্দ চোখ বুজোবে। হে বন্ধু বিদায়! রবীন্দ্রনাথের কবিতা-পাঠের ইচ্ছা হচ্ছে, মানুষের ওপর কবিতা, ইহলোক ছেড়ে যাওয়ার ওপর কবিতা, কিন্তু সেইপবিত্র অধিকার বোধ করি আমি হারিয়ে ফেলেছি দুর্বল হয়ে। তবু বলি হে বন্ধু বিদায়! ইতি—

তোদের মুকুন্দ

চিঠিখানার উপসংহারে এসে মুকুন্দের জন্যে সত্যি আমার চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। সামনে তরংগ বিলোল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, ওপরে নীল নির্মেঘ রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ—তারাই সাক্ষী হয়ে রইলো যে মুকুন্দের জন্যে আমার দু'ফোঁটা চোখের জল পৃথিবী শোষণ করে নিলে। মুকুন্দের জন্যে একজনও অন্তত দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললো!